সাহিত্য-সমালোচনী সভার প্রতিষ্ঠাতা

এবং

বাঙ্গালা সাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ্,

সহোদর-সদৃশ-স্নেহাস্পদ

শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়কে

স্মরণচিহ্নস্বরূপ

এই সামান্য উপহার

প্রদত্ত হইল।

বিজ্ঞাপন।

সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত আমার এক জন অক্ষয়-প্রীতিভাজন অভিন্নহৃদয় আত্মীয় এই প্রবন্ধগুলিকে প্রভাত-চিন্তা নামে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। তদীয় অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া, আজি বান্ধবের এই প্রভাত-চিন্তা নিতান্ত সশঙ্কচিত্তে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমাজে উপস্থিত করিলাম। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় অনুরাগী, যদি ইহা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও তাঁহাদিগের মনোমদ ও তৃপ্তিপ্রদ হয়, তাহা হইলেই আমার যত্ন ও পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

প্রভাত-চিন্তার মুদ্রণাদি কার্য্যসম্পর্কে আমার একান্ত স্নেহের পাত্র, ও প্রিয়তম ছাত্র শ্রীমান্ বাবু হরকুমার বসু বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন। আমি তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

সচীপত্র।

প্রভাত-চিন্তা।

নীরব কবি।

যাঁহারা শ্রুতিসুখাবহ ছন্দোবন্ধে শব্দের সহিত শব্দ গাঁথিয়া, কথার ছটায় সকলকে মোহিত করিতে চেষ্টা করেন, অশিক্ষিত ইতর লোকেরা তাঁহাদিগকেই কবি বলিয়া আদর করে। ঈদৃশ কবি এবং কাব্যের পরীক্ষাস্থান কর্ণ। কবিতাও তালে তালে পঠিত বা উচ্চারিত হয়; তাহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরও তালে তালে বিবিধ ভঙ্গিতে নাচিতে থাকে। পারস্য, উর্দ্দু, হিন্দী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় এইরূপ কাব্যের অভাব নাই। ভাট্, ভট্টাচার্য্য এবং কবিওয়ালা বলিয়া প্রসিদ্ধ গাথকদিগের অধিকাংশই এই শ্রেণীর কবি। কোন একটা নাম দিতে হইলে, ইহাঁদিগকে শাব্দিক কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নহে। কারণ, শব্দবিন্যাসের চাতুরী বিনা ইহাঁদিগের কবিতায় আর কিছুই থাকে না। যদি কিছু থাকে, তাহাও প্রায়ই স্বাদগ্রাহী ব্যক্তির ভোগোপযোগী বলিয়া গ্রাহ্য হয় না।

সহৃদয় রসজ্ঞ ব্যক্তিরা কাব্যের অন্বেষণ করিতে হইলে আর একটু ঊর্দ্ধে আরোহণ করেন। তাঁহারা ছন্দোবদ্ধ বাক্য শুনিয়াই গলিয়া পড়েন না, অথবা কতকগুলি সুললিত শব্দ পাইয়াই মোহিত হন না। যে কথাটি শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া ক্ষণিক আনন্দ উৎপাদন করিল, তাহা হৃদয়স্থান পর্য্যন্তও গমন করে

কি না, ইহাই তাঁহারা অগ্রে বিচার করেন। যে কথায় অন্তরের অন্তরনিহিত কোন লুক্কায়িত রস উছলিয়া না উঠে, সৌন্দর্য্যের কোন নূতন মূর্ত্তি মানসনেত্রের সন্নিধানে উপস্থিত না হয়, হৃদয়-তন্ত্রী নূতন এক তানে বাজিতে না থাকে, কিংবা ভাবভরে আত্মা ঢুলিয়া না পড়ে, তাঁহাদিগের নিকট তাহা কাব্য বলিয়াই গৃহীত হয় না। ইংলণ্ডের অধিকাংশ কবিই ছন্দোবিন্যাস-নৈপুণ্যে শেক্ষপীরের শিক্ষাগুরু; অনেক বালিকার কবিতাও সেই কবিকুলভূষণ বিশ্বারাধ্য কবির কবিতা অপেক্ষা শুনিবার সময় অধিক মিষ্ট;—জয়দেবের গীতগোবিন্দে যেরূপ পদলালিত্য, অভিজ্ঞানশকুন্তল কি উত্তরচরিতের আদি, অন্ত, মধ্য কোথাও তদনুরূপ কিছু লক্ষিত হয় না;—নৈষধের পদমাধুরীর নিকট রত্নাবলী কিছুই নয় বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে। সুরুচিসম্পন্ন বিচক্ষণ লোকেরা তথাপি শেক্ষপীর, কালিদাস এবং ভবভূতিরই পূজা করেন, এবং নৈষধের নাচনি ছন্দের কবিতাপুঞ্জকে এক দিকে সরাইয়া রাখিয়া, রত্নাবলীর সহিতই আশা করিয়া নিরাশ হন এবং নিরাশ হইয়া আশা করেন। কারণ, ভাষা চরণদাসী, ভাবই কাব্যের প্রাণ। যেমন আভরণের তুলনায় রূপ, তেমন শব্দের তুলনায় ভাব, অথবা শাব্দিকের তুলনায় ভাবময় কবি।

কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তির বিবেচনায় কবিতার আর এক গ্রাম আছে। তাহা অতীব উচ্চ এবং দুর্নিরীক্ষ্য। যাহা লিখিত হইল, তাহাই কাব্য এবং যিনি লিখিলেন, তিনিই কবি, এমন কথা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে লিখিত চিত্রে কাব্যের আভা মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কাব্য এক অনির্ব্বচনীয় অমৃত। মনুষ্যের অপূর্ণ এবং অপবিত্র ভাষা উহাকে ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহার হৃদয়

যতক্ষণের জন্য তাদৃশ কাব্যের বিলাসক্ষেত্র হয়, তিনি ততক্ষণের জন্য হিমাচলের গাম্ভীর্য্যের ন্যায়, আকাশের অনন্ত বিস্তারের ন্যায়, এবং যোগরত তাপসের ধ্যানের ন্যায় নিস্তব্ধ ও নীরব রহেন। তিনি হৃদয়েই সেই স্বর্গীয় সুধাসিন্ধুর কণিকা মাত্র পান করিয়া কৃতার্থ হন; লৌকিক বাক্য এবং লোকব্যবহৃত বর্ণমালায় কিছুই ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারেন না। লোকে স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ দৌড়িতে চাহে, কিন্তু কোনমতেই দৌড়িতে পারে না; কথা কহিবার জন্য ব্যাকুল হয়, কিন্তু কোন কথাই অধরে ফোটে না; তিনিও তথাবিধ দশা প্রাপ্ত হইয়া স্তম্ভিত-ভাবেই অবস্থিত থাকেন। প্রকাশের জন্য যত কিছু চেষ্টা সমস্তই বিফল হয়, প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্তও তিরোহিত হইয়া যায়।

কোন তত্ত্বের অন্তস্তলে প্রবেশ করা যাহাদিগের বুদ্ধির অসাধ্য, প্রাগুক্ত সত্যটিকে নিতান্ত লঘু কথা বলিয়া উপহাস করা তাহাদিগের অসম্ভব নহে। তাহারা এইরূপ মনে করিতে পারে যে, কিছু না বলিয়া এবং কিছু না লিখিয়াই যদি কবির অলৌকিক সম্পদ সম্ভোগ করা যায়, তবে ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি? ইচ্ছা হইবে, আর অমনি ধ্যানস্থ হইয়া কবির দেবাসনে উপবেশন করিব; বীণাপাণি মূর্ত্তিমতী হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইবেন; প্রকৃতি তদীয় প্রিয়নিকেতনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিবেন; এবং সংসার কাব্যকুঞ্জের রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করিবে। কিন্তু কবিত্বের এইরূপ আবেশ প্রকৃত প্রস্তাবে মনুষ্যের ইচ্ছাধীন কি না এবং সকলের অদৃষ্টে সকল সময়ে ঘটে কি না, গভীর-ভাবে চিন্তা করা উচিত। ইচ্ছা করিয়া কিছু একটা লিখিয়া তুলা আপনার সাধ্য; ইচ্ছা করিয়া, কিছু একটা বলিয়া, লোকের চিত্তবিনোদন করাও আপনার সাধ্য। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া কে

কোথায় প্রেমিক হইতে পারিয়াছে? আর ইচ্ছা করিয়া কবে কে আপনার হৃদয়কে আপনি বিগলিত করিতে সমর্থ হইয়াছে? ইচ্ছা বুদ্ধিকে চালনা করিতে পারে, মনকেও অনেক দূর উত্তেজিত করিতে পারে; কিন্তু শক্তি ও প্রকৃতির মূল-প্রস্রবণ ইচ্ছার অগম্য স্থান।

চন্দ্রমা মৃদু মৃদু হাসিতেছে, তরঙ্গিণী মৃদুতরঙ্গনাদে নিজ দুঃখের গীত গাইতেছে, বৃক্ষ-পত্র মৃদুসঞ্চালনে অটবীর প্রণয়াহ্বান প্রকাশ করিতেছে, এ সকল অভ্যস্ত কথা অনেকেই অভ্যাসবলে লিখিতে পারে। কিন্তু চন্দ্রমা যখন হাসিতে থাকে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে এ সংসারে কয়টি হৃদয় হাস্যে উৎফুল্ল হয়? কে কলনাদিনী তরঙ্গিণীর তটে উপবিষ্ট হইয়া, তাহার দুঃখের গীতের সহিত নিজ দুঃখের গীতকে মিশ্রিত করিতে ক্ষমতা রাখে? তরুলতার আহ্বানে ইতরজনভোগ্য ভৌতিক ভোগসুখের আহ্বানকে কয় জনে অবহেলা করিতে পারে?

হর্ষ, দুঃখ, ক্রোধ ও প্রীতি প্রভৃতি ভাবনিচয়ের ভাষা চিরকালই গাঢ়তার মাত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে। যে হর্ষ, যে দুঃখ, যে ক্রোধ, অথবা যে প্রীতি নিতান্ত তরল, সহজেই তাহা বাহির হইয়া পড়ে। যেমন তরল ভাব, তেমন তরল ভাষা। মনুষ্যের মন অল্প হর্ষে শফরীর ন্যায় চঞ্চল হয়, অঙ্গ আনন্দে অধীর হইয়া উঠে, হাস্যোল্লাস কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। অল্প দুঃখ অশ্রুজলেই বিগলিত হইয়া যায়। অল্প মাত্রার ক্রোধ ভ্রূকুঞ্চনে ও তর্জ্জন গর্জ্জনেই ব্যয়িত হয়। অতি অল্প প্রেম অল্পজলা স্রোতস্বতীর ন্যায় সর্ব্বদা খল খল করে। কিন্তু যে হর্ষ শরীরের রোমে রোমে অমৃতরসের ন্যায় সঞ্চরণ করে, যে দুঃখ গরলখণ্ডের ন্যায় হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে লগ্ন হইয়া থাকে, যে ক্রোধ চিত্তকে তুষানলবৎ অহর্নিশ দাহন করে, যে প্রেম একবার

নিশার স্বপ্নের ন্যায় অলীক বোধ হয়, আবার আত্মাকে আনন্দ ও নিরানন্দের অধিকার হইতে বহু ঊর্দ্ধে উত্তোলন করে, তাহা প্রায় কখনও দৃশ্য কি শ্রাব্য ভাষায় পরিস্ফুটিত হয় না।

কবিতার ভাষাও এই নিয়মের অধীন। লঘু কবির যত কিছু সম্পদ, তাহা শব্দেই পর্য্যবসিত হয়। তদপেক্ষা গাঢ়তর কবির শব্দ অল্প, রসগাম্ভীর্য্যই অধিক। কিন্তু যখন কাহারও হৃদয়ে কাব্যের সেই অমৃতস্রোত অতিপ্রবলবেগে প্রবাহিত হয়; যখন মন কল্পনার ঐন্দ্রজালিক পক্ষে উড্ডীন হইয়া তারকায় তারকায় প্রকৃতির জ্বলদক্ষরলেখা পাঠ করে; এবং গিরিশৃঙ্গ, সাগরগর্ভ, আলোক ও অন্ধকার সর্ব্বত্র এক সঙ্গে বিচরণ করে; যখন জ্ঞান অনুভূতিতে ডুবিয়া যায়, এবং বুদ্ধি অনুসন্ধানে বিরত হইয়া, তরঙ্গের সহিত তরঙ্গের ন্যায় হৃদয়ে বিলীন হয়; তখন ভয়-বিহ্বলা ভাষা আপনিই জড়ীভূত হইয়া যায়। কে আর কাহার কথা প্রকাশ করে? প্রকৃতি নীরব, কাব্য নীরব, কবিও তখন স্পন্দহীন ও নীরব। ভাবলহরী নীরবে উত্থিত হয়, নীরবে লীলা করে, এবং নীরবেই বিলয় পায়। মুগ্ধা বালা যেমন দর্পণে আপনার সুন্দরচ্ছবি আপনি দেখিয়া, চকিত নয়নে চাহিয়া থাকে, জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী যেমন আপনার সুখে আপনি হাসে, বনান্তবায়ু যেমন আপনার দুঃখে আপনি ক্রন্দন করে, কবিও তখন সেইরূপ আপনার ভাবে আপনি পরিপূর্ণ হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় আপনাতে আপনি নিমজ্জিত হন। কাহার নিকট কি কহিবেন, কে কি শুনিয়া কি কহিবে, কে প্রশংসা করিবে, কে নিন্দা করিবে, কে তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইবে, কে অস্পৃষ্ট থাকিবে, ইত্যাদি কোন চিন্তাই তাঁহার তদানীন্তন মনোময় জগতে স্থান প্রাপ্ত হয় না। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, জীবন ও মৃত্যু সমস্তই তখন তাঁহার

নিকট এক হইয়া যায়। সংসার আছে কি নাই, ইহাও তখন তাঁহার বোধগম্য থাকে না। তাঁহার নিজের অস্তিত্বও ক্ষণ-কালের জন্য বিলুপ্ত হয়।

যাঁহারা বিধাতার প্রসাদে এইরূপ কবি-প্রকৃতি লাভ করিয়াছেন, এবং লোকাতীত কবিত্বের পূর্ণ আবির্ভাবে সময়ে সময়ে এইরূপ অভিভূত হন, আমরা তাঁহাদিগকে চিনি আর না চিনি, তাঁহারাই সাধক, তাঁহারাই সিদ্ধ এবং তাঁহারাই মানবজাতির প্রাণ। তাঁহাদিগের উদাসীনতাই আসক্তি, কাঠিন্যই কোমলতা, বৈরাগ্যই ভোগ, এবং তৃষ্ণাই তৃপ্তির শেষ। সমীরণ তাঁহাদিগের স্বর্গোপম পবিত্র স্পর্শে শীতল ও সুরভি হয় বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি, নচেৎ এই স্বার্থচিন্তাময় সংসার-মরুতে সকলেই প্রাণে মরিতাম। পৃথিবী তাঁহাদিগের পদরেণু প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই মনুষ্যের নিবাসযোগ্য হইয়াছে, নচেৎ ইহা নিরয়-নিবাস হইতেও ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিত। তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই মনুষ্যের ভাষা অদ্যাপি শোকদুঃখের সময় মনুষ্যের দগ্ধহৃদয়কে শীতল করিতেছে; নিরাশায় আশ্বাস দিতেছে; দয়া, উৎসাহ, শান্তি ও প্রেম প্রভৃতি অতিমানুষিক ভাবের ভারবহন করিতেছে; নচেৎ ইহা পিশাচকণ্ঠ হইতেও অধিকতর শ্রুতিকঠোর হইত।

অভিমান।

মানবপ্রকৃতির কতকগুলি ভাব কুসুমসদৃশ;—কোমল ও কমনীয়, স্মরণ করিলেই হৃদয় দ্রবীভূত হয়। কতকগুলি ভাব আবার একান্ত তীব্র ও কঠোর। তৎসমুদয়ের পরিচিন্তনে মনে ভয় কি ভক্তিরই সঞ্চার হয়; প্রীতি অথবা কারুণ্যরসের লেশও অনুভূত হয় না। যদি কোন সুন্দর ও সুস্থকায় যুবা, ব্যাধভীতকুরঙ্গের ন্যায়, শত্রুভয়ে বিহ্বল হইয়া, কাহারও পদতলে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে, বৈরনির্যাতনের জন্য স্বকীয় শক্তি প্রয়োগ না করিয়া, পরের দিকেই চাহিয়া থাকে এবং আপনার কর্ত্তব্যের ভার পরের স্কন্ধে ফেলিয়া দিয়া, অবিরলধারায় অশ্রু-মোচন করে, তাহার প্রতি ভক্তি কিম্বা শ্রদ্ধার উদ্রেক হওয়া যার পর নাই অস্বাভাবিক। কিন্তু তাহার তৎকালীন পরিম্লান মুখচ্ছবি, তাহার সেই কাতর চক্ষু, কাতর ভাবভঙ্গি এবং ততো-ধিক কাতর গদগদকণ্ঠ অবশ্যই হৃদয়কে করুণায় পরিপ্লুত করিতে পারে। আশ্রিত জনের প্রতি অনুরাগ মহাত্মাদিগের প্রকৃতি-সিদ্ধ। পক্ষান্তরে, যদি কোন ব্যক্তি বিপদের পর বিপদে আক্রান্ত হইয়াও, একটুকু না হেলে—অভাবনীয় দুঃখরাশির মধ্যে আকণ্ঠ ডুবিয়াও, দুঃখকে দুঃখ বলিয়া গণনা না করে, এবং পরসহায়তার শত প্রয়োজন সত্বেও, কাহারও প্রীতি কি সহানুভূতির প্রত্যাশী না হইয়া, আপনার বাহুবলের উপরই দর্পভরে দণ্ডায়মান হয়, তাহার সেই কঠোর ভাব দর্শন করিয়া, কেহই প্রণয়রসে বিগ-লিত হইবে না। যে প্রণয়ের ভিখারী নহে, কে তাহাকে আপনা

হইতে আদর করিয়া প্রণয় উপহার দিতে পারে? কিন্তু তাদৃশ ভ্রূভঙ্গশূন্য, স্বাবলম্ব পুরুষের গাম্ভীর্য্য ও গৌরব চিন্তা করিলে, মনে স্বভাবতঃই যে, ভয় কি সম্ভ্রমের ভাব উপস্থিত হইবে, ইহা অবধারিত কথা।

আমরা অভিমানকেও মনুষ্যপ্রকৃতির এমনই একটি কঠোর ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করি। অভিমানের সহিত কোমলতার কোন সম্বন্ধ নাই। অভিমান দয়ার ন্যায় পরের দুঃখে গলিয়া পড়ে না, প্রীতির ন্যায় পরের চক্ষে চক্ষু দিয়া তাকাইয়া থাকে না, এবং মমতার ন্যায় পরকে আপন করিতেও যত্ন করে না। অভিমানীর প্রতি লোকের যে আপাততঃ বিদ্বেষ জন্মে, তাহারও নিগূঢ় হেতু এই; সে চায় না, সুতরাং কেহই তাহাকে দেয় না। সে একটুকু স্বতন্ত্র, সুতরাং সকলের বিরাগভাজন। কিন্তু তাহা বলিয়া যথার্থ অভিমানের ভাবকে কখনই ঘৃণার বিষয় বলিতে পারি না।

অভিমান দুই প্রকার,—রক্ষক ও পীড়ক। যে অভিমান বিষমক্ষিকার মত পরের মর্ম্মস্থলে দংশন করে, অকারণে পর-পীড়নে প্রবৃত্ত হয়, পরের স্বাধীনতা সহ্য করিতে পারে না, উহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, সন্দেহ নাই। ঐরূপ অভিমান জগতের উপদ্রববিশেষ এবং মানবজাতির কলঙ্ক। উহা অভিমান নহে, বস্তুতঃ অভিমানের বিকার। কবিকল্পিত অসুর কি অপদেবতার ললাটেই উহা শোভা পায়। মনুষ্য যখন ঐরূপ অভিমানে অন্ধী-ভূত হইয়া, আপনাকে এক অলৌকিকবস্তুজ্ঞানে পূজা করে, এবং ন্যায়ের শাসন, স্নেহের শাসন, এবং সর্ব্বপ্রকার সদ্ভাবের শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া, সংসারে আপনার শাসনই প্রবল করিতে ইচ্ছুক হয়, তখন তাহার মনুষ্যত্ব কতদূর থাকে, ঠিক বলিতে পারি না। ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রধান নায়ক মেরাবোর প্রতি দৃষ্টিপাত

কর। যিনি মেরাবোর জীবনের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়াছেন, বোধ হয়, মনুষ্যের পদধূলি হইয়া থাকিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে, তথাপি মেরাবোর শক্তি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মেরাবোর অভিমান লইয়া সকলকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা হইবে না। যদি কাহারও গৃহে গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ ইত্যাকার দুরভিমানের কণামাত্র লইয়াও কেহ প্রবিষ্ট হন, সুখ ও শান্তি সে গৃহ হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে। এইরূপ অভিমান হৃদয়কে গ্রাস করিলে, আকৃতির সৌন্দর্য্য একবারে বিনষ্ট হয়, চক্ষু এক অপ্রাকৃত বিষাক্ত তেজ উদ্গীরণ করে এবং অধরনিঃসৃত প্রত্যেক কথায় লোকের অঙ্গ জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু যে অভিমান, কাহাকেও পীড়া না দিয়া, সুন্দর একখানি বর্ম্মের ন্যায় হৃদয় ও মনকে পরের আক্রমণ হইতে আবরিয়া রাখে;—যাহা কটাক্ষ, কটুভাষা কিংবা ভ্রূকুঞ্চনে প্রদর্শিত না হইয়া, মান ও গৌরবের মূর্ত্তি ধারণ করে;—যাহা সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে প্রতিভাত ভাস্করের ন্যায় এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে শোভা পায়, অথচ চক্ষুর অসহ্য হয় না, তাদৃশ সদভিমানের অনাদর করা দূরে থাকুক, আমরা উহাকে মানব-প্রকৃতির অমূল্য আভরণ বলিয়া স্বীকার করি।

অভিমান আর যশোলালসা সমান নহে। যশোলিপ্সু পরান্নভোজী, পরপ্রত্যাশী। অভিমানী আপনার বুদ্ধিতে আপনি পরিতৃপ্ত। যশোলিপ্সু হৃদয়ের কণ্ডূয়নে সকল সময়ে আকুল থাকে; কে তাহাকে কি বলিবে, এই ভাবনাতেই তাহার নিদ্রা দূর হয়। অভিমানী শান্ত, সুস্থির ও গভীর। লোকের নয়নদর্পণে সন্তোষ, কি অসন্তোষের ভাব ক্ষণে ক্ষণে যেরূপ প্রতিফলিত হয়, যশোলিপ্সুর মুখচ্ছবিও হর্ষ হইতে বিষাদের দিকে এবং বিষাদ হইতে হর্ষের দিকে সেইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে। অভিমানী চিত্রার্পিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দ ও নিশ্চল। পৃথিবীর স্তুতি

নিন্দা তাহার নিকট কাকের কোলাহল হইতে অধিক বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু যশোলিপ্সা প্রকৃতিতে যে অপূর্ব্ব একটুকু মাধুর্য্য আনিয়া দেয়, অভিমান কঠোর কর্ত্তব্যবুদ্ধির আশ্রয় পাইয়া সেটুকু বিনাশ করিয়া ফেলে।

যথার্থ অভিমান এক অচিন্তনীয় সামর্থ্য। উহা সাহস, বীরতা এবং সহিষ্ণুতার অভাব পূর্ণ করিয়া দেয়; যাহা কিছু লজ্জাকর ও গ্লানিজনক, যাহা কিছু নীচ ও ক্ষুদ্রজনোচিত, অন্তঃকরণকে তাহার উপরে তুলিয়া রাখে; প্রলোভনের সময় প্রহরীর ন্যায় সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, এবং আপদের কালে বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করে। এই দুঃখপূর্ণ কণ্টকাকীর্ণ, বিঘ্নসঙ্কুল সংসারে যথার্থ অভিমান অনেক সময়ে ভেলার ন্যায় অবলম্ব হয়। কেহ লাভের আশায় বাণিজ্য করিয়া সর্ব্বস্বে বঞ্চিত হইলে, সকলকে বঞ্চনা করিবার জন্য তাহার শতবার মতি হইতে পারে। অভিমান তখন তাহাকে রক্ষা করে। সে সহস্র গ্রন্থিবিশিষ্ট জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিতে সম্মত হয়, তথাপি ছলনা করিয়া কাহারও কপর্দ্দক রাখিতে চায় না। পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্যই অবস্থার পূজা করে। অবস্থা বিগুণ হইলে, অনেক স্থলেই সমস্ত সংসার বিগুণ হয়। মাতা সস্নেহকণ্ঠে সম্ভাষণ করেন না, পত্নী মুখ তুলিয়াও চান না এবং ভুলিয়াও মনে করেন না, বন্ধুজনেরা বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জিত হন, সুতরাং দেখিলেই দূরে প্রস্থান করেন। দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ কেহ অহর্নিশ ঈদৃশ অরুন্তুদ দুঃখে দগ্ধ হইলে, অভিমান আর কিছু না করুক, অন্ততঃ সেই দুঃখকে সহিয়া থাকিবার জন্য পুরুষোচিত ক্ষমতা দেয়। অভিমান না থাকিলে, হেলেনার কারাস্থিত কুক্কুরদিগের তীক্ষ্ণ দংশনেই বোনাপার্টির তনুত্যাগ হইত এবং অভিমান না থাকিলে, রাজ্যভ্রষ্ট প্রথম চার্লস্, অরাতিনিযুক্ত, দুরক্ষরভাষী দুর্নীত প্রহরিদিগের অত্যা-

চার সহ্য করিয়া, ক্ষণকালও প্রাণধারণ করিতে পারিতেন না।

সৌভাগ্যের সময় অভিমানকে অনায়াসে উপেক্ষা করা যায়, বরং তাদৃশ উপেক্ষার ভাবই তখন যথার্থ অভিমানশালিতার পরিচয় দান করে। যখন চক্ষুর একটি দৃষ্টি কিংবা জিহ্বার একটি বাক্য নিঃসৃত হইতে না হইতেই, সেই দৃষ্টি কিংবা সেই বাক্য নিয়তমুখপ্রেক্ষিগণকর্তৃকশশব্যস্তভাবে গৃহীত হয়, এবং সকলে সমবেত হইয়া উহার অর্থগ্রহ করিতে উপবেশন করে ;—যখন পরিচয়মাত্র থাকিলেই লোকে পরম আত্মীয় বলিয়া সন্নিহিত হয়, হাসিলে শতমুখে হাসি ফোটে, এবং একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস অকারণে ত্যাগ করিলেও নিকটস্থ সকলের মুখ বিষাদে মলিন হইয়া যায়;—যখন বায়ুর প্রত্যেক তরঙ্গ প্রশংসার ধ্বনিই আনয়ন করে, এবং সমস্ত সংসার জ্যোৎস্নাধৌত নিশার ন্যায় আনন্দে ঢল ঢল প্রতীয়মান হয়, মনুষ্য তখন ফলভরনত পাদপের ন্যায় নিতান্ত নুইয়া পড়িলেও, তাহার চরিত্রে নীচতা কি কলঙ্কের স্পর্শ হইবে না। বিনয়াচ্ছন্নগর্ব্বিতা সম্পদের দিনেই সুন্দর দেখায়। কিন্তু, অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে একবারে ভূতলে আনীত হইলে, মনুষ্য কখনই সদভিমান পরিত্যাগ করিয়া, মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। তখন তাহাকে সকল বিষয়েই পদে পদে গণনা করিতে হয়, এবং কথাটি কহিতে হইলেও তাহার পাঁচবার চিন্তা করা আবশ্যক হইয়া উঠে। সে সরলান্তঃকরণে কাহারও গুণবাদ করিলে, লোকে তাহা চাটুবাদ বলিয়া অবহেলা করে, এবং সে তাহার হৃদয়ের প্রীতির উচ্ছ্বাস সংবরণ করিতে না পারিয়া, কাহারও প্রণয়ের পিপাসু হইলে, লোকে তাহাকে অম্লান বদনে সুচতুর বণিক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছুক হয়। যেমন সুখসম্ভোগ সকলের ভাগ্যে

ঘটিয়া উঠে না, বিনীত ও নম্র হওয়াও সেইরূপ সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সকলের পাদলেহন করুন, তাহাতেও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু, ভাগ্য যাহার প্রতি অপ্রসন্ন, অভিমানই তাহার অদ্বিতীয় সহায়। সে তাহার শেষ অবলম্ব অভিমানকেও যদি বিসর্জ্জন করে, তাহা হইলে তাহাকে ক্রমে ক্রমে কত নীচে নামিতে হয়, সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

এক সম্ভ্রান্তচরিত্র ব্যক্তি, অবস্থার পরিবর্ত্তনিবন্ধন কোন ধনীর গৃহে অপরিচিতভাবে আশ্রয় লইয়া, দিনপাত করিতেছিলেন। তাঁহার প্রতিপালক, একদিন তাঁহার কোন কার্য্যে বিশেষ সন্তোষ-লাভ করিয়া তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ দেন এবং তাঁহার বিস্তর উপকার করেন। কেহ অপকার কারলে, তাহা অক্ষুব্ধচিত্তে সহ্য করা যায়। কিন্তু কেহ উপকার করিলে, সেই উপকারের ভার বহন করা, উন্নত প্রকৃতিক মনুষ্যের পক্ষে বড়ই কঠিন হয়। উল্লিখিত ছদ্মবেশী মহাত্মা, আশাতীতরূপে উপকৃত হইয়া, হৃদয়োত্থিত কৃত-জ্ঞতার আবেগ নিবারণ করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার আশ্রয়দাতাকে সম্বোধন করিয়া, বাষ্পগদ্গদবচনে বলিলেন,— "মহাশয়! আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, প্রাণ থাকিতে তাহা ভুলিতে পারিব না। আমার পূর্ব্বের অবস্থা থাকিলে আমি আপনার পাদযুগল মস্তকে ধারণ করিতাম। দুঃখ এই—ঈদৃশ উপকারী বান্ধবকে যে, নির্ম্মুক্তচিত্তে কৃতজ্ঞতা দিব, এমন ভাগ্যও এইক্ষণ আমার নাই।" যদি অভিমান কোন পদার্থ হয়, তবে ইহারই নাম অভিমান। অভিমানী প্রাণকে অব্যবহার্য্য জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় অবহেলায় পরিত্যাগ করিতে পারে; কষ্ট ও ক্লেশ যাহা কিছু সম্ভবে, তাহা অনবসাদে বহন করিতে সমর্থ হয়; জ্বলন্ত বহ্নিমুখে প্রবিষ্ট হইতেও ভীত হয় না,

কিন্তু আত্মার চৈতন্য থাকিতে মানত্যাগ করিতে পারিয়া উঠে না।

মনুষ্যের মন যথার্থ অভিমানে অলঙ্কৃত হইলে, উহার আশা এবং আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই ঊর্দ্ধদিকে আরোহণ করে। তখন পর-শ্রীতে তাহার কাতরতা হয় না। হৃদয় পরের সৌভাগ্যে খিন্ন হইলে, অভিমানী আপনার নিকট আপনি অপরাধী হয়, এবং ঐ ক্ষুদ্রতা অনুভব করিয়া লজ্জায় মরিয়া যায়। যে আপনাকে অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য এবং সর্ব্বতোভাবে সারশূন্য বিবেচনা না করে, সে অন্যদীয় সম্পদে কদাপি বিষণ্ণ হইতে পারে না। অভি-মানী অগোচরে আক্রমণ করে না, অন্ধকারে আঘাত করিতে জানে না, এবং একবারের পরিবর্ত্তে শতবার মরিতে হইলেও, অযোগ্যস্থলে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান হয় না। কবির কল্পনা বল, আর ইতিহাস বল, মহাবাহু ভীষ্ম, শিখণ্ডীর দুর্ব্বল কর-নিক্ষিপ্ত শরনিকরে রোমে বিদ্ধ হইয়াও, তাহাকে ফিরিয় আঘাত করিতে পারেন নাই। যে জাতীয় লোকেরা নীচ-প্রকৃতি ও স্বার্থপর, তাহাদিগের মধ্যে সম্মুখ সংগ্রাম অপেক্ষা উপাংশুহত্যা অধিক প্রচলিত, বীরাচার অপেক্ষা ছদ্মব্যবহার ও ছলনারই অধিক আদর, এবং প্রকৃত বীরপুরুষ অপেক্ষা কপট-কুশল কার্য্যসাধকেরই অধিক সম্মান। তাহারা সাধনের প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি করে না, সিদ্ধিই তাহাদিগের সর্ব্বস্ব। যে জাতীয় দিগের অন্তরে অভিমানের অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে, তাহাদের রীতি-নীতি সর্ব্বাংশে ইহার বিপরীত। তাহারা যাহা কিছু করে, মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড তাহার সাক্ষী থাকেন। সিদ্ধি হউক, কি না হউক, তদর্থ তাহারা ব্যস্ত হয় না; সাধনপদ্ধতিতে কোন রূপে কলঙ্কস্পর্শ না হয়, ইহাই তাহাদিগের মুখ্য চিন্তা। ভারবি বলিয়াছেন—

'অভিমানধনস্য গত্বরৈ-
রসুভিঃ স্থাস্নু যশশ্চিচীষতঃ।
অচিরাংশুবিলাসচঞ্চলা
ননু লক্ষ্মীঃ ফলমানুসঙ্গিকম্।'

অর্থাৎ—অভিমানই যাহাদিগের ধন—যাহারা ক্ষয়শীল প্রাণে উপেক্ষা দিয়া অক্ষয় মান সঞ্চয় করিতে অভিলাষী হয়, তাহারা সৌদামিনীর বিলাসলীলার ন্যায় চিরচঞ্চলা কমলার সেবা করে না। যদি তিনি কৃপা করেন, সে কৃপা আনুসঙ্গিক ফল।

অভিমানী অন্যের অভিমান সহ্য করিতে পারে না, এ কথা অলীক। যে আপনার মানকে মূল্যবান্ বস্তু বলিয়া মনে করে, সে কদাচ অন্যের অপমান সহ্য করিতে পারে না। আর্য্য ঋষিগণ মানীর মানভঙ্গকে এক মহাপাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং এ বিষয়ে পৃথিবীর সকল স্থানের মহাত্মারাই তাঁহাদিগের মতানুগামী। যখন ক্রোধোন্মত্ত ভীম মানী দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করেন, রাজরাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির তখন অনর্গল অশ্রুমোচন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। যখন মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ রাক্ষস, চাণক্যের বুদ্ধিকৌশলে সর্ব্বথা অভিভূত হইয়া, পাটলিপুত্র নগরে উপস্থিত হন, তখন অভিমানী চাণক্য ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহার পাদবন্দনা করেন। যখন পরাজিত পোরস, আলেক্‌জেণ্ডরের সম্মুখে আনীত হইয়া, গর্ব্বিতভাবে আপনাকে রাজা বলিয়া পরিচয় দেন, বিজয়ী বীরচূড়ামণি তখন রুষ্ট কি অসন্তুষ্ট না হইয়া, তদীয় তেজস্বিতায় নিতান্ত প্রীতি লাভ করেন। প্রুশিয়ার সম্রাট্ ফরাশিদিগকে পরাজয় করিয়া যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা দশ বৎসরের মধ্যেই বিলুপ্ত হইতে পারে। কিন্তু, তিনি সিংহাসনভ্রষ্ট লুই নেপোলিয়নের

সম্মাননার জন্য যেরূপ যত্ন দেখাইয়াছেন, ইতিহাস তাহা কখনও ভুলিতে পারিবে না।

কেহ রূপের অভিমানে ফাটিয়া পড়ে। কেহ সামান্য কোন গুণ থাকিলে, সেই অভিমানে মৃত্তিকায় পাদনিক্ষেপ করিতে চায় না। কেহ পরের চরণ লেহন করিয়া, একটুকু পদোন্নতি লাভ করিলে, সাধু কিংবা অসাধু কোন উপায় অবলম্বন করিয়া, বৈষয়িক ব্যাপারে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইলে, সংসারে দশজনের মধ্যে কোন না কোন রূপে গণনীয় হইতে পারিলে, অভিমানে উন্মত্ত হয় এবং চক্ষে অন্ধকার দর্শন করে। ঈদৃশ জঘন্যভাব অভিমানের বিড়ম্বনা মাত্র। যথার্থ অভিমান, মহত্ত্বের একজাতীয় বস্তু। উহাতে চাতুরী ও চাঞ্চল্য কিছুই নাই, এবং উহা কখনও তুলনায় তুলিত হয় না। প্রতি মনুষ্যের আত্মাতে যে এক অচিন্তনীয় নিজত্বের ভাব নিহিত রহিয়াছে,—যে ভাব অবলম্বন করিয়া, লোকে আপনাকে আমি বলিয়া নির্দ্দেশ করে এবং অন্য হইতে আপনার পার্থক্য অনুভব করিতে সমর্থ হয়, সকল প্রকার আক্রমণ এবং অত্যাচার হইতে তাহার রক্ষা করা এবং সেই ভাবকে ক্রমে পরিস্ফুটিত এবং পরিবর্দ্ধিত করিয়া মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হওয়াই অভিমানের প্রকৃত কার্য্য।

যে মনুষ্য এরূপ অভিমানের ভাবকে অন্তরে পরিপোষণ না করে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কাহাকে বলে, তাহা সে কখনই অনুভব করিতে পারে না। সে অপরাংশে যত কেন উন্নত না হউক, তাহার ললাটদেশে সকল সময়েই তদীয় প্রভুর নাম অঙ্কিত দেখিবে। আর, যে জাতীয় লোকেরা, জাতীয় গৌরব ও জাতীয় স্বাধীনতার জয়পতাকা উড়াইবার অভিলাষে, এক হস্তে মান এবং আর এক হস্তে প্রাণকে তুলিয়া দিয়া, জাতি-

সাধারণের একীভূত হৃদয়ে জাতির অভিমানকে আদরের সহিত রক্ষা না করে, তাহাদিগের অন্য যত প্রকারের উন্নতি ও কীর্ত্তি হউক, তাহারা কখনই মানবজাতিরূপ বিরাটপুরুষের এক অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইবে না। তাহাদিগের সম্পদ সমৃদ্ধি যাহা কিছু আছে, এবং যাহা কিছু কালক্রমে হইতে পারে, সমস্তই পরাধিপত্যের গ্লানিজনক চিহ্নে চিরদিন চিহ্নিত থাকিবে।

প্রকৃতিভেদে রুচিভেদ

যাহা লোকের নিকট এক পদার্থ, তাহা শাস্ত্রকারদিগের নিকট আর এক পদার্থ। শাস্ত্রকারেরা অতি সহজ কথা বুঝাই-বার জন্যও এক এক সময়ে এমন দুর্ভেদ তর্কজাল বিস্তার করেন যে, লোকে তাহাতে কোন প্রকারেই সহজে প্রবেশ করিতে পারে না, প্রবিষ্ট হইলেও বাহির হইবার পথ দেখে না। রুচি কাহাকে বলি, এই কথা-প্রসঙ্গেও এইরূপ ঘটিয়াছে। আলঙ্কারিক ও দার্শনিক পণ্ডিতবর্গ রুচি শব্দের যে সকল সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞসমাজে অবিদিত নহে। কিন্তু ঐ সমস্ত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা এমনই দুর্গম ও জটিল যে, যাঁহারা বিশেষরূপে দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই, তাঁহারা কিছুতেই তাহার মর্ম্মার্থ পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন না। আমরা এই নিমিত্ত ঐ পথ পরিত্যাগ করিয়া, যে সকল ভাব ও কথা সর্ব্বত্র পরিচিত আছে, তাহা লইয়াই রুচিশব্দের তাৎপর্য্য বিবৃত করিতে যত্নপর হইব।

কোন বিষয় কাহারও মনে ভাল লাগে, কোন বিষয় কাহারও মনে ভাল লাগে না। কোন একটি বিশেষ সংগীত শ্রবণ করিয়া কেহ একবারে গদ্গদচিত্ত হন, কাহারও কর্ণে সেই সংগীতটিই বিষধারা বর্ষণ করে। অধিকারীরা রঙ্গভূমিতে অব-তীর্ণ হইয়া, যে ভাবে দেবলীলার অভিনয় করেন, তাহা দেখিবার জন্য কেহ পঞ্চ ক্রোশের ব্যবধান হইতে পদব্রজে চলিয়া আসেন; কেহ তাদৃশ অভিনয়কে যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনার অবশেষ মনে করিয়া অব্যাহতি লাভের জন্য পঞ্চ ক্রোশ ব্যবধানে চলিয়া

যান। কেহ একখানি কাব্য পাঠ করিয়া পদে পদে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন; কেহ সেই কাব্যখানিকে নীরস কাষ্ঠসমান বিবেচনা করিয়া অনির্ব্বচনীয় বিরক্তির সহিত দূরে ফেলিয়া দেন এবং যাহা বিজ্ঞব্যক্তিরা ঘৃণায় স্পর্শ করেন না অথবা ইচ্ছা হইলেও লজ্জায় স্বকীয় গ্রন্থাধানে রাখেন না, এমন একখানি কদর্য্য পুস্তক লইয়া দিবা রাত্রি পড়িয়া থাকেন। একখানি চিত্রপট দর্শনে কাহারও হৃদয় একবারে উছলিয়া উঠে এবং দৃষ্টি উহাতেই একবারে লাগিয়া থাকে; আর এক ব্যক্তি সেই পটখানি পুনঃপুনঃ দর্শন করিয়াও তাহাতে সৌন্দর্য্য কি মাধুর্য্যের কোন চিহ্ন দেখিতে পান না। ইত্যাদি স্থলে বলিব যে, যাঁহার মনে ঐরূপ কোন বিষয়, কি গীত, কি কাব্যাদিতে প্রীতির পরিবর্ত্তে বিরক্তি জন্মে, তাঁহার উহাতে রুচি নাই। সুতরাং, রুচির সারার্থ মনের আনন্দ এবং সেই আনন্দ-জন্য স্পৃহা। যাহা ভাল লাগিল, তাহা রুচিকর; এবং যাহা ভাল লাগিল না, তাহা অরুচিকর।

কিছুতেই রুচি নাই, এরূপ লোক জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি কেহ থাকেন, তাঁহার অবস্থা স্মরণ করিয়া কেহই তাঁহাকে হিংসা করিবে না। তিনি পণ্ডিত হইহেও মহামূর্খ, পরমসাধু হইলেও মহাপাতকী। এই শোভাবিলাসিনী সুরম্যমেদিনী তাঁহার বসতিস্থান নহে। তাঁহার অধ্যয়ন ও বিদ্যালোচনা ভস্মে ঘৃতাহুতি, বিবাহ পাপ, বন্ধুজনসংসর্গ অকথ্যযন্ত্রণা, এবং পার্থিব জীবন প্রত্যক্ষ নরকভোগ। সূর্য্য, মেঘপটলকে প্রভাতকান্তিতে রঞ্জিত করিয়া, তাঁহার জন্য উদিত হয় না; চন্দ্রমার অমল-স্নিগ্ধ কৌমুদী তাঁহার জন্য মৃদুহাসি হাসে না; তরুলতা ও সরোবরের নির্ম্মলসলিলরাশি কুসুমনেত্র বিকসিত করিয়া, তাঁহার দিকে ফিরিয়া চায় না; বিহঙ্গগণ সুধাসিক্ত কলকণ্ঠে কখনও তাঁহাকে আহ্বান করে না; ভারতীর

বীণাধ্বনিসদৃশী কবিতা তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস পায় না; প্রীতি ভয়ে কি বিরাগে তাঁহার নিকট চক্ষু মেলে না; সংক্ষেপতঃ এই সুবিস্তীর্ণ ধরণীমণ্ডলে কেহই আপনাকে তাঁহার বলিয়া পরিচয় দেয় না। কিন্তু জগদীশ্বরপ্রসাদাৎ এইরূপ নিরানন্দ, নিরালম্ব, চিরবিষাদমগ্ন, কিম্ভূত লোকের সংখ্যা অতি অল্প। পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্যই রুচিবিশিষ্ট। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কোন না কোন বিষয়ে রুচি, অর্থাৎ আসক্তি ও আনন্দ বোধ আছে; এ গীতে না হউক, অন্য গীতে এবং এ ভাবে না হউক, অন্য ভাবে; কিন্তু কোন না কোন গীতে এবং কোন না কোন ভাবে সকলেরই হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠে।

অনেকে রুচি শব্দটিকে অতীব সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিয়া, শুধু কাব্যনাটকাদির দোষগুণঘটিত বিচারের কথাকেই ইহার বিষয় মনে করেন, এবং যাঁহার কাব্য নাটকে তেমন পাণ্ডিত্য নাই, তাদৃশ ব্যক্তি নিতান্ত সুরুচিসম্পন্ন হইলেও, তাঁহাকে রুচিহীন, রসহীন এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাদ-শক্তি-বিহীন বলিয়া অবধারণ করিয়া রাখেন। ইহা ভ্রম। রুচির বিষয় এই অনন্ত জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি। যাহা সুন্দর, যাহা সুশ্রাব্য, যাহা অন্যথা সুখপ্রদ কিংবা মনোমদ, তাহার সহিতই রুচির সম্পর্ক আছে। কাহার চক্ষু কি দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল হয়, কে কি শুনিতে ভালবাসে, কে কিরূপ আলাপ করে ও কিরূপ বেশবিন্যাসে অনুরাগ দেখায়, কি প্রকার আভরণে কাহার মনে আনন্দ জন্মে, কিরূপ আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়কলায় হৃদয় আসক্ত থাকে, এই সমস্ত কথাই রুচির পরিচায়ক। উপাসনাদি উচ্চকল্পের অনুষ্ঠাননিচয়ও রুচির সহিত সম্পর্কশূন্য নহে। দুইটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের ভজনাগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া তত্রত্য সামগ্রীসমূহ এবং উপাসকদিগের রীতিপদ্ধতি, ভাবভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর পরীক্ষা কর, অথবা একসম্প্র-

দায়স্থ দুই ব্যক্তির উপাসনাক্রিয়া দর্শন কর, তাহাতেও রুচিগত পার্থক্যাদির পরিচয় পাইবে। রুচি বিশ্বাসের উপর কার্য্য করে, জীবনের সকল কার্য্যেই নিত্যসঙ্গিনীর ন্যায় উপদেশ দেয়, এবং মুখের কথা ফুটিতে না ফুটিতে, আকারে, ইঙ্গিতে ও হাস্য ভ্রূকুঞ্চনাদি শতমুখে প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

এইক্ষণ প্রশ্ন এই,—মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের সর্ব্বত্র, সকল সময়ে এবং সকল বিষয়েই যে বিষম রুচিভেদ পরিলক্ষিত হয়, ইহার কারণ কি? যাঁহারা মানবমনের গূঢ়তত্ত্বসকল আলোচনা করিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এক এক জনে এই প্রশ্নের এক এক প্রকার উত্তর করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, দয়া কি ন্যায়পরতার ন্যায় রুচি নামে মনুষ্যের একটি পৃথক্ মনোবৃত্তি আছে; সেই বৃত্তির বিকাশ অথবা অবিকাশ কিংবা অপূর্ণ বিকাশই রুচিভেদের একমাত্র কারণ। কেহ বলিয়াছেন, রুচি শোকানুভাবকতার নামান্তর—যিনি যে পরিমাণে সৌন্দর্য্যের স্বাদগ্রহণে সমর্থ, তাঁহার রুচি সেই পরিমাণে বিকশিত ও মার্জ্জিত; আর যিনি যে পরিমাণে সৌন্দর্য্য বিষয়ে অন্ধ, তাঁহার রুচি সেই পরিমাণে অস্ফুট ও অমার্জ্জিত। এই শ্রেণির চিন্তকদিগের মতে সুরুচির নাম সৌন্দর্য্যের উপাসনা এবং কুরুচির নাম কদর্য্য বস্তুতে প্রীতি। কাহারও মত এই যে, বয়োভেদ অথবা অবস্থাভেদ হইতেই রুচিভেদ জন্মে। যেমন জীবনে দিন দিন নূতন নূতন পরিবর্ত্তন ঘটে, রুচিতেও দিন দিন সেইরূপ নূতন নূতন পরিবর্ত্তন আসিয়া অলক্ষিতভাবে উপস্থিত হয়। কিশোরবয়সে যাহা ভাল লাগিত, যৌবনে তাহা ভাল লাগে না; এবং যৌবনে যাহা প্রিয় বোধ হয়, পরিণতবয়সে তাহা প্রিয় বোধ হয় না। অন্য এক শ্রেণির পণ্ডিতদিগের মতানুসারে শিক্ষাভেদ ভিন্ন রুচিভেদের কার-

ণান্তর নাই। শিক্ষাপ্রভাবে মনুষ্য দেবতা, শিক্ষাবিরহে মনুষ্য পশু। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তির রুচিবিষয়ক পার্থক্যই ইহার প্রমাণ। উভয়েই সমান মনুষ্য। কিন্তু একজন অমৃতের জন্য লালায়িত, আর একজন কর্দ্দমতোয় পান করিয়াই পরিতৃপ্ত।

আমরা রুচি নামে পৃথক্ একটি মনোবৃত্তি স্বীকার করি না। এইরূপ একই বৃত্তির সর্ব্ববিষয়ব্যাপকতা অনুমানসিদ্ধও নহে, এবং প্রমাণ দ্বারাও কোন প্রকারে সমর্থিত হইতে পারে না। চক্ষু যদি শুনিতে না পায়, তবে তাহাতে চক্ষুর নিন্দা নাই; এবং কর্ণও যদি দেখিতে না পায়, তবে তাহা কর্ণের দোষ বলিয়া পরিগণিত হয় না। ইহা ভিন্ন আমরা প্রাগুক্ত একটি মতেরও প্রতিবাদী নহি। তবে আমাদিগের সহিত এই এক বিশেষ বিভিন্নতা, আমরা উল্লিখিত কারণসমূহের কোন একটিকেই রুচিভেদের একমাত্র কারণ না বলিয়া, প্রত্যেকটিকেই পৃথক্ একটি কারণ বলি, এবং সকল কারণের অভ্যন্তরে প্রকৃতিভেদকেই রুচিভেদের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। শিক্ষা বলিলে সংসর্গজন্য দোষগুণ তাহাতে আসিতে পারে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে তাহার অন্তর্গত হয় না; এবং বয়ঃকালাদিজন্য অবস্থাবিশেষকে রুচির প্রণোদক বলিয়া গ্রহণ করিলে, প্রবৃত্তিবিশেষের প্রাবল্য অথবা দুর্ব্বলতা তাহার অন্তর্গত হইলেও, শক্তিভেদ ও শিক্ষা প্রভৃতি অতিপ্রধান কারণ নিচয় তাহার মধ্যে পরিগৃহীত হইতে পারে না! কিন্তু প্রকৃতিভেদকে আদিকারণ বলিয়া উল্লেখ করিলে সকলই তাহাতে আসিয়া পড়ে। প্রকৃতি যে সকল শক্তি প্রদান করেন, শিক্ষা তাহার বিকাশ করে, শিক্ষার অভাবে তাহা জড়তা প্রাপ্ত হয়; সংসর্গবিশেষে তাহা উন্মেষিত হয়, সংসর্গবিশেষে তাহা বিপথগামী অথবা

একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। শোক দুঃখ ও হর্ষবিষাদজনিত মানসিক অবস্থা এবং বয়ঃকালাদিও প্রকৃতির উপর সামান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করে না। সুতরাং শক্তিভেদ, শিক্ষা, সংসর্গ, প্রবৃত্তিবিশেষের প্রাবল্য, এবং অবস্থাভেদ প্রভৃতি যত প্রকার কারণ রুচির উন্নতি কি অবনতি বিষয়ে অনুকূলতা অথবা প্রতিকূলতা করে, সমস্তই প্রকৃতিভেদরূপ এক কারণের অন্তর্ভূত।

দুইটি লোক তুল্যরূপে ক্রীড়াসক্ত। তন্মধ্যে একজন তাসপাসা লইয়াই সময়ের স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতে ভাল বাসেন, আর একজন অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা এবং অশ্বগজের কর্ণভেদি গর্জ্জন শুনিবার জন্য বালক সেকেন্দর সা'র মত প্রমত্ত হন। এ স্থলে শিক্ষাভেদ এই রুচিভেদের কারণ নহে, অবস্থার বিভিন্নতাকেও কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, শোভানুভাবকতা প্রভৃতি বৃত্তিবিশেষেরও কার্য্যকারিতা নাই। এখানে যথার্থ কারণ প্রকৃতশক্তিভেদ। যিনি তাসপাসাতেই নিরুপম আনন্দ অনুভব করেন এবং উহা লইয়াই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতে ভালবাসেন, তিনি যে ধাতুতে গঠিত, সেকেন্দর সাহ সে ধাতুতে গঠিত নহেন। উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত শক্তিবিষয়ে অনেক প্রভেদ আছে, তাহাতেই ক্রীড়াপ্রমোদঘটিত রুচিবিষয়েও এত প্রভেদ। যিনি যৌবনে মেরেঙ্গো, অস্তার্লিজ ও জিনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরুষকারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া সমস্ত ইউরোপ-ভূখণ্ডকে পদাঘাতে কম্পিত করিয়াছিলেন, তিনি যদি কৌমারে নবনীতকোমলা বালিকার মত কন্দুকলীলাতেই ব্যাসক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে মনোবিজ্ঞানের সমস্ত কথাই মিথ্যা কথা বলিয়া সপ্রমাণ হইত। তাঁহার রুচি শৈশব সময় হইতেই কোন্ দিকে প্রধাবিত ছিল এবং তিনি কি লইয়া ক্রীড়াসহচরদিগের সহিত খেলা করিতেন এবং কিরূপ প্রমোদে সুখী

হইতেন, তাহা তদীয় চরিতাখ্যায়কদিগকে জিজ্ঞাসা কর।

মনুষ্যের প্রাকৃত শক্তি সম্বন্ধে একটি অত্যাবশ্যকীয় কথা আমাদিগকে এস্থলে সংক্ষেপে বলিয়া লইতে হইয়াছে। নতুবা শক্তিভেদের সহিত রুচিভেদের কিরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইবে না। যদি কাহাকেও শক্তিমান্ পুরুষ বলি, তাহা হইলে এমন সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে যে, শক্তির যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিকল্পিত হইতে পারে, সমস্তই সেই একাধারে নিহিত রহিয়াছে। যে দুই বীরপুরুষের কৌমাররুচির প্রসঙ্গ হইল, তাঁহারা এক বিষয়ে যেমন অসাধারণ শক্তিমত্তা দেখাইয়াছেন, তেমন অনেক বিষয়ে নিতান্ত হীন-শক্তি ছিলেন। আবার অনেকে প্রস্তাবিত বিষয়ে নিতান্ত নিকৃষ্টকল্পের লোক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিলেও, অন্যান্য বহু-বিষয়ে অতীব প্রশংসনীয় ক্ষমতা ও রুচিশালিতা প্রদর্শন করিয়া-ছেন। ইংলণ্ডে জনসন্ প্রভৃতি পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা মনুষ্যের শক্তিঘটিত এই নিয়ম সুন্দররূপে বুঝিতেন না, এবং বুঝিতেন না বলিয়াই রুচিভেদ সম্বন্ধে কোন কথা হইলে তর্কতরঙ্গে ভাস-মান হইয়া নানাবিধ ভ্রমসঙ্কুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, পশ্চিমদিকে যাইতেও যে বলের আবশ্যক, পূর্ব্বদিকে যাইতেও যখন ঠিক্ সেই পরিমাণ বলই প্রচুর হইয়া থাকে, তখন যে বুদ্ধি যথাযথরূপে প্রযুক্ত হইয়া বৃক্ষশাখা হইতে ছিন্নবৃন্ত ফলের প্রস্খলনদর্শনে মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছে, সেই বুদ্ধিই যদি আর একপথে পরিচালিত হইত, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ওথেলো কি অভিজ্ঞানশকুন্তলের ন্যায় অপূর্ব্বকাব্যও অনায়াসে বিরচিত হইত। কিন্তু বিচার এবং বহুদর্শন দ্বারা ইহা এইক্ষণ বৈজ্ঞা-নিক সত্যের ন্যায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, মানবীয় শক্তি এক

এবং অখণ্ড হইলেও বহুধাবিভক্ত এবং বহুধারা-প্রবাহিত। জগতের নিত্যপরীক্ষিত বৃত্তান্তচয়ও সর্ব্বথা এই সিদ্ধান্তেরই পরিপোষকতা করে।

কাহারও চক্ষু এবং বুদ্ধি সৌন্দর্য্যবিষয়ে এমন সুনিপুণ যে, তিনি উহার বিভেদ ও অনুভেদ সকল তিল তিল করিয়া ভাগ করিতে পারেন; এবং একখানি আলেখ্য দর্শন করিলে তাহার কোথায় কি গুণ এবং কোথায় কি দোষ আছে, তাহা দৃষ্টিপাতমাত্রই অঙ্গুলিনির্দ্দেশ সহকারে বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হন; অথচ তাঁহার সঙ্গীতবিষয়িণী বুদ্ধি এত অল্প যে, তানসেন কি সুরিমিঞার গন্ধর্ব্বকণ্ঠানুকারিণী ভুবনমোহিনী গীতলহরীও তাঁহাকে প্রবোধিত করিতে সমর্থ হয় না। যদি রূপের লীলাভঙ্গি এবং সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্মভেদ বিষয়ে আলাপ কর, তাহা হইলে মনে হইবে যে, তাঁহার ন্যায় সুরসিক ও সুরুচি-বিশিষ্ট পুরুষ আর একটি সম্ভবে না। কিন্তু সঙ্গীতপ্রসঙ্গে কথা তুলিলে, তাঁহাকে তেমনই আবার অরসিক ও অকর্ম্মণ্য লোক বলিয়া অবজ্ঞা করিবে। দুর্জ্ঞেয় গণিততত্ত্বের অন্তস্তলে কত কি মধু সঞ্চিত রহিয়াছে! যাঁহারা স্বভাবতঃ গণিতবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারা তাহা পান করিয়া ধ্যানরত তাপসের ন্যায় বিমোহিত থাকেন। কিন্তু প্রকৃতি যাঁহাদিগকে সে বুদ্ধি, সে শক্তি দেন নাই, তাঁহারা অন্যরসে রসিক হইলেও উহার প্রবেশদ্বারের রেখা সমূহকে নরকপালস্থিত অদৃষ্টরেখার ন্যায় অপাঠ্য জ্ঞানে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যান। দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হইলে, শক্তি-গত বিভিন্নতার এইরূপ আরও সহস্র দৃষ্টান্ত সঙ্কলিত হইতে পারে; কিন্তু যাহা উদাহৃত হইল, তদ্দ্বারাই বিলক্ষণরূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে, যাঁহার যে বিষয়ে প্রকৃতিদত্ত শক্তি নাই, তাঁহার প্রকৃতিতে সে বিষয়ে রুচি থাকা নিতান্ত নিসর্গবিরুদ্ধ;

আর যিনি যে বিষয়ে স্বভাবতঃ শক্তিসম্পন্ন, তিনি সে বিষয়ে স্বভাবতঃই অনুরক্ত ও রুচিবিশিষ্ট। যেমন শরীরের অঙ্গ-বিশেষে সামর্থ্য না থাকিলে, সেই অঙ্গসম্পর্কিত ব্যায়ামে ইচ্ছা অথবা আনন্দ বোধ হয় না, তেমন মনেরও বৃত্তিবিশেষে সমুচিত শক্তি না থাকিলে, সেই বৃত্তির পরিচালনায় তৃপ্তিলাভের প্রত্যাশা থাকে না।

একই শক্তির পরিমাণগত তারতম্যানুসারেও রুচির বৈচিত্র্য জন্মে। গায়কেরা সাধারণতঃ গীতবিদ্যাকে ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। ধ্রুপদ গুরুপাক, কষ্টসাধ্য এবং সংগীতের চরমোৎকর্ষ। খেয়াল কাঠিন্য ও কোমলতা মিশ্রিত; উহাতে রাগ রাগিণীর ব্যাকরণ আছে, অথচ টপ্পারও একটু একটু রস আছে। টপ্পা ফুলের মধু, সর-বতের ন্যায় সুপাক, সুখপেয়, সহজসাধ্য। অনেকে গাইতে পারেন কিম্বা গান শুনিয়া সুখী হন, কিন্তু টপ্পা পর্য্যন্তই তাঁহা-দিগের শক্তির দৌড়। উহার উর্দ্ধে উড্ডীন হইতে হইলে তাঁহাদিগের পক্ষ অবসন্ন হইয়া পড়ে। অনেকে আর এক গ্রাম উর্দ্ধে উঠিয়া বিচরণ করেন। আর, যাঁহারা প্রকৃতির কৃপায় উচ্চশ্রেণীর শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উহার শেষ শিখরে সমারূঢ় হইয়া এক অলৌকিক আনন্দরসে নিমগ্ন হন। তাঁহারা কি সুখে সুখী হইলেন, অশক্ত অদীক্ষিত ব্যক্তিরা নিম্নভূমিতে থাকিয়া, তাহা সংশয়াকুল বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করেন। যাঁহারা আরও জড়বুদ্ধি, তাঁহারা উপহাস করেন। এইরূপ অনেকেরই চিন্তাশক্তি আছে। কিন্তু কাহারও চিন্তা-শক্তি উচ্চ শ্রেণির,—প্রখর, বলবিশিষ্ট এবং শ্রমসহ। কাহারও চিন্তাশক্তি বালক অথবা স্ত্রীলোকের মত,—দুর্ব্বল, শ্রমবিমুখ এবং স্থৈর্য্যহীন। চিন্তাশক্তির এই মাত্রাগত প্রভেদ অনুসারে

এই দুই শ্রেণিস্থ লোকের মধ্যে অধ্যয়ন ও পাঠ্যনির্ব্বাচনাদি বিষয়ে কিরূপ রুচিগত বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া উঠে, তাহা কে না প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন?

শিক্ষা রুচিকে কিরূপ পরিশোধিত ও পরিমার্জ্জিত করে, তাহার নিদর্শনবাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। যে লৌহখণ্ড খনি হইতে এইমাত্র উত্তোলিত হইল, তাহাও লৌহ, এবং যাহা নিপুণকারুকরের হস্তে পুনঃপুনঃ শোধিত ও পুনঃপুনঃ মার্জ্জিত হইয়া, এইক্ষণ স্বকীয় প্রভায় রজতপ্রভাকেও পরিহাস করিতেছে, তাহাও লৌহ। কিন্তু উহাকে স্পর্শ করিতেও লোকের অবজ্ঞা জন্মে, আর ইহা বীরজনবাহুতে অমূল্য ভূষণের ন্যায় মণিমুক্তার সহিত বিলম্বিত হয়। অঙ্গার ও হীরক একই পদার্থের বিভিন্ন মূর্ত্তি বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে। অথচ উভয়ে কত অন্তর। পারিসের সুশিক্ষিতা নবীনা এবং সাঁওতাল কি গারোজাতীয়া অশিক্ষিতা যুবতী প্রকৃতিতে পরস্পর বহুদূরবর্ত্তিনী নহে। কিন্তু উভয়ের রুচিগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে, কে ইহাঁদিগকে একজাতীয় জীব বলিয়া স্বীকার করিতে পারে? আভরণপ্রিয়তা উভয়েতেই সমানবলবতী এবং উভয়েই সমানরূপাভিমানিনী। প্রশংসার কলকণ্ঠও উভয়কে সমানরূপে অভিভূত করে। তথাপি শিক্ষার শোধনী প্রক্রিয়ায় উভয়ে এইক্ষণ প্রভেদ জন্মিয়াছে যে, একটি সুরলোকবিহারিণী বিদ্যাধরী এবং আর একটি পিশাচের প্রণয়সহচরী। সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত, উভয় শ্রেণিস্থ গীত, বাদ্য ও নৃত্যাদিতে তুল্য অনুরক্ত। কিন্তু সুশিক্ষিতসমাজে গীতের নাম স্বরসুধা, অশিক্ষিতসমাজে গীতের নাম কর্ণপীড়া; সুশিক্ষিতসমাজে বাদ্যযন্ত্রের নাম বীণা বা পিয়ানো, অশিক্ষিতসমাজে বাদ্যযন্ত্রের নাম ঢক্কা কি ভগ্নকাংস; সুশিক্ষিতসমাজে নৃত্যের নাম লাস্য কি লীলাতরঙ্গ, অশিক্ষিতসমাজে নৃত্যের নাম

লম্ফ ঝম্ফ কি প্রতিবেশীর নিদ্রাভঙ্গ। কবিতায়ও এইরূপ। সুশিক্ষিতেরা যে কবিতায় আদর করেন, তাহাতে কল্পনার বৈচিত্র্য থাকে, অথচ কলঙ্কের পঙ্ক দৃষ্ট হয় না। অলঙ্কার ও রসমাধুরীর প্রাচুর্য্য থাকে, অথচ সে অলঙ্কার চক্ষুতে কণ্টকবৎ বিদ্ধ হয় না, সে রস আত্মাকে আবিল করে না। পক্ষান্তরে গ্রাম্যরুচিবিশিষ্ট অশিক্ষিত ব্যক্তিরা যে কবিতা লইয়া প্রমত্ত হন, তাহাতে কল্পনা না থাকুক, কর্দ্দম থাকে, এবং রস ও অলঙ্কার না থাকুক, ঝাল ও ঝঙ্কার থাকে। কর্ণাটরাজমহিষী এইরূপ কবিদিগকে কপি বলিয়াছিলেন; বঙ্গে ইহাঁদিগকে কেহ কবিওয়ালা বলে এবং কেহ কবিকুলের কালিমা কিম্বা কবিকুঞ্জের কাক বলে।

এই স্থলে কেহ এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, যদি শিক্ষার এতই মাহাত্ম্য থাকিবে, তবে যাঁহারা সুশিক্ষিত বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের রুচিও অনেক সময় নিতান্ত অধোগতি প্রাপ্ত হয় কেন? তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে, জ্বলন্তবহ্নিরূপিণী দময়ন্তীর পবিত্র কাহিনী শ্রবণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া, বারবণিতার কুৎসিত যাত্রা শুনিবার জন্য অধীর হন; বেন্থাম্ ও মিল্ প্রভৃতি মহামনস্বিদিগের গভীরচিন্তাপ্রসূত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাবলিকে ভস্মস্তূপ বিবেচনায় একদিকে সরাইয়া রাখিয়া, কতকগুলি অর্থশূন্য অকর্ম্মণ্য পুস্তক দিয়া সেই স্থান পূরণ করেন; এবং বাল্মীকি, ভবভূতি ও মিল্টন প্রভৃতি সাক্ষাৎ দেবোপম স্বর্গীয় কবিদিগের কাব্যকলাপে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে রাত্রির দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, রেনল্ডের গুপ্তকথা অথবা ঐরূপ আর কিছু অস্পৃশ্য বস্তু লইয়াই অনিমেষলোচনে উপবিষ্ট থাকেন। এই রুচিবিকারের কারণ কি? এই প্রশ্নের প্রথম

উত্তর,—শিক্ষার অপূর্ণতা। যদি তাহা না মান, ইহার দ্বিতীয় উত্তর,—মানসিকশক্তির অপকৃষ্টতা। যদি তাহাতেও তৃপ্ত না হও, তবে ইহার তৃতীয় এবং শেষ উত্তর,—প্রবৃত্তিবিশেষের অপ্রশংসনীয় ও অনুচিত প্রবলতা। প্রবৃত্তির পঙ্কিল স্রোত যখন খরধারে প্রবাহিত হয়, তখন শিক্ষা, শক্তি ও সুরুচি সমস্তই সৈকতভূমিতে জলরেখার ন্যায় বিধৌত ও বিলুপ্ত হইয়া যায়।

মনুষ্যের উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয়বিধ প্রবৃত্তিই রুচির উপর কর্ত্তৃত্ব করে। ভাল হউক আর মন্দ হউক, স্ববিষয়ের অনুসরণ করা মনোবৃত্তি মাত্রেরই নৈসর্গিক ধর্ম্ম। যাঁহাদিগের স্নেহ, মমতা ও দয়াবৃত্তি স্বভাবতঃ প্রবলা, তাঁহারা করুণরসের কাব্য পড়িতেই ভালবাসেন, এবং যে সকল দুঃখের কথায় দয়া উত্তেজিত হয়, তাহা পাঠ কি শ্রবণ করিয়া অজস্র অশ্রুধারা মোচন করেন। তাঁহাদিগের নিকট অশোকবনে সীতার বিলাপ, দেস্‌দিমোনার মৃত্যুকালীন খেদ, পিঞ্জরাবরুদ্ধা রেবেকার স্তম্ভিতমনস্তাপ, পতিগতপ্রাণা সূর্য্যমুখীর শোকরুদ্ধ সুকোমলকণ্ঠ যেরূপ হৃদ্য ও মনোহর; গুলেবকওয়ালীর গুপ্তপুষ্পকাননে গুপ্তপ্রেমালাপ, লায়লা ও মজনুর প্রেমঘটিত চতুরতা এবং রাধা ও চন্দ্রাবলীর প্রণয়-কলহ কখনই তেমন বোধ হয় না। সেইরূপ যাঁহাদিগের দয়া দুর্ব্বল, ধর্ম্মবুদ্ধি নিস্তেজ, শোভানুভাবকতা হীনপ্রভ, এবং অপর উচ্চতর বৃত্তি অর্দ্ধবিকসিত, অথচ কামাদি নিকৃষ্টবৃত্তি নিতান্ত বলবতী, তাঁহারা ভাগবতের ব্রজলীলা কিংবা লুক্রিসিয়ার বিড়ম্বনা, ডন জুয়ানের অপকীর্ত্তি কিংবা চতুর্থ জর্জ্জের চরিত্রবর্ণন পাঠ করিয়া যেরূপ তৃপ্তিলাভ করেন, আর কিছুতেই তাহা প্রাপ্ত হন না। যে দেশে যে সময়ে এই শেষোক্ত শ্রেণির লোকের সংখ্যা নিতান্ত অধিক হয়, সে দেশে সেই সময়ে কুৎসিত কাব্যাদির সংখ্যা কিরূপ অধিক হইয়া পড়ে, কুরুচি সংক্রামক রোগের

ন্যায় গৃহে গৃহে কিরূপ পরিব্যাপ্ত হয় এবং সৎকবি ও সুলেখক-বর্গ কিরূপ হতাদর হইয়া যান, তাহা ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি সকল দেশের সামাজিক ইতিহাস পাঠেই অনায়াসে অবগত হওয়া যাইতে পারে।

মনুষ্যের জীবনচরিত

মহানুভাব ব্যক্তিদিগের জীবনচরিত পাঠ করিবার জন্য, সকলেই কৌতূহল প্রকাশ করে। যাঁহারা, সংসারে আসিয়া খাইয়া শুইয়াই কাল কর্ত্তন করেন নাই, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবনযাপন করিয়াছেন,—যাঁহারা তৃণের মত জোয়ার ভাটায় যাতায়াত না করিয়া, এই অনন্ত কালসমুদ্রের সৈকতভূমিতে আপনাদিগের পদ-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদিগের আবির্ভাবে ধরা টলমল করিয়াছে, চতুর্দ্দিকে হুলুস্থুলু পড়িয়াছে, মানবজাতি হয় হাসিয়াছে, নয় কাঁদিয়াছে, তাদৃশ অনন্যসাধারণ ক্ষণজন্মা পুরুষদিগের ঘরের কথা জানিবার জন্য মনে স্বভাবতঃই এক বিষম কণ্ডূয়ন উপস্থিত হয়। তাঁহারা ছোট বেলায় কিরূপে খেলা করিয়া বেড়াইতেন; তাঁহারা যৌবনকালে প্রবৃত্তির তরঙ্গে কিরূপ হাবুডুবু খাইতেন; তাঁহারা পরিপক্ক প্রৌঢ়দশায় উপনীত হইয়া, সমাজের অভিনয়-ভূমিতে কিরূপে কার্য্য করিতেন এবং যবনিকার অন্তরালেই বা কিরূপে অবস্থিত থাকিতেন, এই সমস্ত কথা বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সবিশেষরূপে অবগত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে।

নীতিবিশারদ পণ্ডিত মহাশয়েরা বলেন, পৃথিবীর প্রধান পুরুষদিগের জীবনবৃত্ত পাঠ কর; ক্রমেই মন, নীচভাব পরিত্যাগ করিয়া, মনুষ্যোচিত উচ্চতার প্রতি আসক্ত হইবে। কবিসমাজ উপদেশ করেন, মহামতি মনুষ্যদিগের আলেখ্যের প্রতি স্থির-নয়নে তাকাইয়া থাক,—তাঁহাদিগের চরিত চিন্তা কর, তবেই

বুঝিতে পারিবে যে, মহত্ত্বের দ্বার তোমার জন্যও উন্মুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের জীবনচরিত কোথায় পাইব? পৃথিবীতে পোনে ষোল আনা হইতেও অধিক লোক আসে আর যায়। তাহারা যে কোন সময়েও জীবিত ছিল, এমন বলিবার কারণ নাই। যদি তাহারাও জীবিত থাকিয়া থাকে, তবে তাহাদিগের শয়নখট্টা এবং অবলম্বযষ্টিও জীবিত ছিল। যাঁহারা জীবিত ছিলেন বলিয়া জগতে পরিচিত, তাঁহাদিগের বিষয়ই বা কে কি জানিতে পারে? কোন মৃত মনুষ্যের কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট দেহ দর্শন করিয়া, কেহই তাহার মুখচ্ছবি ও রূপলাবণ্যের কল্পনা করিতে সমর্থ হয় না। সে কিরূপে হাসিত, হাসির সময়ে তাহার অধরপল্লবে কি কি ভাব বিশেষরূপে প্রকাশ পাইত,—তাহার ভ্রূ কোন্ সময়ে আকুঞ্চিত, কোন্ সময়ে সরলায়ত থাকিত, তাহার নয়নযুগল, মুখরভৃত্যের ন্যায় মনের কি কি নিগূঢ় কথা লোকের নিকট কহিয়া ফেলিত, ইত্যাদি সহস্র বিষয় মাংসচর্ম্ম-বিবর্জ্জিত একখানি করোটি এবং কয়েকখানি অস্থির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হওয়া যায় না। মনুষ্যের জীবনচরিতও এইরূপ। মনুষ্য মনুষ্যের বহিঃস্থ ক্রিয়াকলাপ অবলোকন করে। প্রকৃত মনুষ্যজীবন কুসুমকোরকের অন্তঃস্থ কিঞ্জল্কের ন্যায় পটলের পর পটলে আবৃত থাকে। কাহারও চক্ষু সেখানে প্রবেশপথ পায় না। মনুষ্য আপনাকেই আপনি জানে না। পরকে কিরূপে জানিবে? আপনার জীবন আপনিই পাঠ করিতে কেহ সমর্থ হয় না। পরের জীবন কিরূপে পাঠ করিবে? যদিও প্রকৃতির কৃপাবলে, কেহ মানবজীবনগ্রন্থের দুই চারি পংক্তি, কি দুই চারি পৃষ্ঠা, পাঠ করিতে সমর্থ হন; তিনি আবার ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না। মানুষী ভাষা আজও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, এবং বোধ হয়, এই অপূর্ণতা কখনও ঘুচিবে

না। প্রভাতে কি সন্ধ্যার সময় অথবা ঝটিকার প্রাক্‌কালে আকাশের জলদ-মালা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত শোভা ধারণ করে, কত পরিবর্ত্তনের অধীন হয়, তাহা নিবিষ্টমনে পাঠ করিতে পারিলেই, মনুষ্যের বিস্তর প্রশংসা; ভাষায় আবার তাহা আঁকিয়া তুলিব, কেহই এমন আশা করে না। মনুষ্যের মন আকাশের জলদমালা হইতেও অধিক পরিবর্ত্তশীল। ভাগীরথীর লহরীলীলার বিরাম আছে, কিন্তু চিরচঞ্চল মনুষ্যমনের ভাব-তরঙ্গের কখনও বিরাম নাই। কে তাহা গণনা করিবে? কে আবার তাহা বর্ণনা করিবে?

জীবনচরিতে পাঠ করা গেল, আলেক্‌জেণ্ডার, সহসা ক্রোধে অধীর হইয়া, তদীয় প্রিয় ও পুরাতন সহচর ক্লিটসকে স্বহস্তে সংহার করিলেন, এবং ক্যাসেণ্ডরের সাহসিক ভাষা সহ্য করিতে না পারিয়া, নিতান্ত ইতর জনের ন্যায় তাহাকে অপমান করিলেন। এই দুইটি—কার্য্য। ইহাদের কারণ কোথায়? আলেক্‌জেণ্ডার এক সময়ে পুরুষপদবাচ্য বীরদিগের ললাটের তিলক ছিলেন। কেন অকস্মাৎ তিনি এবংবিধ কাপুরুষপদবীতে পদনিক্ষেপ করিলেন?—এক সময়ে তিনি শত্রুরও সম্মান করিতে জানিতেন, কেন পরিশেষে তিনি মিত্রের মর্য্যাদাও ভুলিয়া গেলেন? তাঁহার প্রকৃতির এত পরিবর্ত্ত কেন ঘটিল? এই শৃঙ্খল-বদ্ধ কারণ পরম্পরা কে দেখিয়াছে এবং কে তাহা বুঝাইতে পারিবে? বোনাপার্টি প্রসিদ্ধি লাভের পূর্ব্বে, মনুষ্যের জাতিসাধারণ অধিকার সমূহের একজন প্রধান রক্ষক ছিলেন। অবশেষে তাঁহার কিরূপ মত-স্খলন হয়,—রক্ষক, দুদিন দশদিন যাইতে না যাইতেই, কিরূপ ভয়ঙ্কর ভক্ষকবেশ ধারণ করেন, তাহা সকলেই জানেন। তাঁহার বাহিরের জীবন অতি সুন্দর-রূপে লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার বাহিরের জীবন

যে আভ্যন্তরীণ জীবনের সামান্য ছায়া মাত্র,—যে জীবনে 'কারণ' সকল প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিয়া, দৃষ্টজগতে কার্য্যফল প্রসব করিয়াছে, তাহা অবগত হইবার কোন উপায় নাই। এ কথা সত্য যে, চরিতাখ্যায়কেরা এই উভয় মহাত্মার চরিত্র-ভ্রংশের বহু কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের হেতুবাদে মনস্তৃপ্তি হয়, ইহা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারি না।

অনেকে, এই সমস্ত কথা আলোচনা করিয়া, মনুষ্যের স্বরচিত জীবনবৃত্ত পাঠেই বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, পরে যাহা লিখে, তাহা হয় অজ্ঞতার পরিচয় দেয়, না হয় অনুচিত স্তুতি কি অনুচিত নিন্দায় পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু মনুষ্য, পৃথ্বীতল হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে আপনার সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়া যায়, তাহাতে অসত্য, অত্যুক্তি অথবা অজ্ঞতামূলক ভ্রমপ্রমাদের কণিকাও থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষে কেহ কোন দিন আপনার জীবনকাহিনী আপনি লিখিয়া গিয়াছেন, এমন আমরা জানি না। বাবর এবং আরংজীব প্রভৃতির কথা অবশ্য গণনার বাহিরে রাখিতে হইবে। কারণ ইহাঁদিগকে ভারতবাসী বলিয়া স্বীকার করিতে আজও কাহারও মন সম্মতি দান করিবে না। ভারত-বর্ষের নাম উচ্চারণ করিলে, যে অস্তমিত আর্য্যজাতির ভূত-বৃত্তান্ত মনে সমুদিত হয়, তাঁহারা যদি স্বদেশের ইতিহাস এবং স্ব স্ব জীবনের ইতিবৃত্ত লিখিয়া যাইতেন, তবে এই ধরাবিলু-ণ্ঠিতা ভারতমাতা এখনও গায়ের ধূলি ঝাড়িয়া, আবার দণ্ডায়-মান হইতে পারিতেন। পুরাতন নাম এবং পিতৃপুরুষদিগের পুরাতন কাহিনী মৃতদেহেও জীবন সঞ্চারণে সমর্থ হয়। ফল-কথা, এই মনুষ্যের জীবনবৃত্ত পাঠ করিয়া, কোন উপকারের

প্রত্যাশা করিলে, আমাদিগকে ইউরোপ এবং আমেরিকাতেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। স্বদেশে সে সুখের আশা নাই।

ইউরোপ এবং আমেরিকার অনেক মহাত্মাই আপনার জীবন আপনি গ্রন্থবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কেহ স্বকীয় জীবনের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আখ্যায়িকার প্রণালীক্রমে লিখিয়া গিয়াছেন। কেহ, সে পথ অবলম্বন না করিয়া, প্রণয়িবন্ধু-বান্ধব কিম্বা পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের নিকট নিজ জীবনের প্রধান অপ্রধান ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া, সর্ব্বদা পত্র লিখিয়াছেন। বন্ধু. বান্ধব কিম্বা পরিবারস্থ ব্যক্তিরা তদীয় পরলোক-প্রাপ্তির পর, সেই পত্র যত্নপূর্ব্বক সঙ্কলন করিয়া,—প্রসঙ্গের সঙ্গতির জন্য মধ্যে মধ্যে আবার আপনাদিগের উক্তি পূরিয়া দিয়া, মনোজ্ঞ একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইংরেজী গ্রন্থালয়ে ঈদৃশ গ্রন্থের কিছুই অসদ্ভাব নাই। নাম করিতে ইচ্ছা হইলে, অনায়াসে বড় ছোট শত শত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে মনুষ্যের জীবনবৃত্ত পাঠ করা আবশ্যক, কাহারও স্বরচিত জীবনচরিতপাঠে তাহা সম্যক্ সফল হয় কি না, বোধ হয়, ইহা সংশয়ের বিষয়।

মনুষ্য ভীরু। মনুষ্য দুর্ব্বল। মনুষ্য পরের প্রশংসায় বাঁচে, পরের অপ্রশংসার শ্বাসমাত্র অঙ্গে লাগিলে ঢলিয়া পড়ে। সুতরাং, মনুষ্য আপনার সম্বন্ধে আপনি যাহা বলে. তাহা বেদ-বাক্যস্বরূপ মানিয়া লওয়ার পূর্ব্বে, দুইবার চিন্তা করা আবশ্যক। এইরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, মনুষ্য কোন নিভৃতস্থলে বসিয়া, মনের কবাট একবারে খুলিয়া দিয়া, জীবনের সমস্ত গূঢ়কথা যখন লিখিয়া যায়, তখন তাহাকে অবিশ্বাস করা একান্ত অসঙ্গত। কিন্তু আমরা স্পষ্টতার অনুরোধে উল্লেখ করিতেছি, এস্থলে বিশেষ কোন মনুষ্যের প্রতি

অবিশ্বাস করিবার কারণ না থাকিলেও, মানবজাতির প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতাকে সম্যক্ বিশ্বাস না করিবার বহুকারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। মনুষ্য একাকী উপবিষ্ট হইয়াই আপনার কথা লিখে বটে; কিন্তু তাহার অবিরামপ্রসবিনী চিরসঙ্গিনী কল্পনা তাহাকে সে নিগূঢ় নির্জ্জন স্থানেও অসংখ্য মনুষ্যচক্ষুতে পরিবেষ্টিত করে। সে যেই মনে করে যে, তাহার দিকে বর্ত্তমান ও ভাবী কালের লক্ষ চক্ষু তাকাইয়া রহিয়াছে, অমনি তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। যাহা সাদা মনে লিখিয়া ফেলিব স্থির করিয়াছিল, এইক্ষণ সে তাহা একটুকু সাবধানভাবে লিখে, এবং লিখিয়া, এখান হইতে একটি অনুস্বার তুলিয়া ফেলে, এবং ওখানে দুটি বিসর্গ ভরিয়া দেয়। তাহার হাতের কাগজখানিতেও তাহার সম্যক্ প্রত্যয় থাকে না। এইরূপ সংশোধনের পর সংশোধনে, পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তনে, লেখকের প্রকৃত ও লিখিত জীবনে, ক্রমে ক্রমে এত প্রভেদ হইয়া পড়ে যে, বিবেচনার সহিত দেখিলে, একটিকে অন্যটির প্রতিবিম্ব বলিয়া স্বীকার করাও কঠিন হয়। পৃথিবীর অনেক প্রধান পুরুষের স্বলিখিত জীবনবৃত্ত এই দোষে দূষিত।

অনেকে অপেক্ষাকৃত সরল হইয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ আত্মবঞ্চক। তাঁহারা বস্তুতঃ যাহা নহেন, আপনাকে আপনার নিকট তাহা প্রমাণ করিবার অভিলাষে পুনঃপুনঃ প্রয়াস পাইয়া, পরিশেষে এমন জটিল ভ্রমজালে জড়িত হইয়া পড়েন যে, তাহা হইতে বাহির হওয়া আর তাঁহাদিগের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে না। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সম্প্রদায়ের অনেক স্মরণীয়নামা ব্যক্তি আপনার কাহিনী আপনি কহিতে গিয়া, এইরূপে ঠকিয়াছেন। তাঁহারা, ক্রোধে অধীর হইয়া পরপীড়নে প্রবৃত্ত হইলে, তাদৃশ প্রবৃত্তিকে ধর্ম্মবৃত্তির স্ফূরণ বলিয়া মনের নিকট প্রবোধ দিয়াছেন, এবং

লোককেও সুতরাং ঐরূপ বুঝাইতেই চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সরলতার প্রতি অনেকের সংশয় নাই; কিন্তু তাঁহারা সরলভাবে নিজ নিজ মনের গতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক কথার উপরও লোকের তেমন আস্থা নাই।

কেহ কেহ আবার, সরলতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া, দম্ভের শরণ লইয়াছেন। তাঁহারা দম্ভভরে সংসারকে তৃণের সমানও জ্ঞান করেন নাই। লোকে হাসুক কি ভালবাসুক, কিছুরই প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, নিজ জীবনের লোকভয়ঙ্কর দোষসমূহ কীর্ত্তন করিতেও তাঁহাদিগের অরুচি হয় নাই। তাঁহারা জগতকে চমকিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এবং বস্তুতঃও জগৎ চমকিত হইয়াছে।

আধুনিক কবিসম্প্রদায়ের প্রিয় পুত্তল লর্ড বাইরণকে আমরা এই শ্রেণির লোক বলিয়া মনে করি। বাইরণ আত্মসম্বন্ধে ভ্রমান্ধ ছিলেন না; অভিমানে অন্ধীভূত ছিলেন। তিনি, অভিমানের উপর নির্ভর করিয়া, শব্দের অর্থ পরিবর্ত্ত করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। তাঁহার অভিধানে পরিণামদর্শিতার নাম ভীরুতা এবং লোকের প্রতি শ্রদ্ধার নাম কাপুরুষতা। অনেক কথা তাঁহার লিখিতে লজ্জা হয় নাই; লোকের পড়িতে লজ্জা হয়। লজ্জার সঙ্গে দুঃখও হয়। অমন ব্যক্তিটা, কেন সাধ করিয়া, আপনার অঙ্গে আপনি এত দাগ দিল,—ছিল যা ছিল, কেন কালিকলমে আবার তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গেল, ইহা মনে করিলে মন পোড়ে। তিনি কবিবর মূর এবং অন্যান্য বন্ধুর নিকট পত্র লিখার ছলে, আপনার যে ছবি আঁকিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার সমকালবর্ত্তিদিগের মধ্যে অনেকেই তাহা তাঁহার ছবি বলিয়া স্বীকার করেন না। তিনি কবি,—তাই কল্পনার কুহকে পড়িয়াছিলেন। আপনার প্রকৃতি যত না নিন্দিত, (কি ভয়ানক

দম্ভ!) লোকের নিকট উহার তদপেক্ষাও নিন্দিত মূর্ত্তি প্রদান করিতে যত্নশীল হইয়াছেন। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে অতিনিন্দা ও অতিস্তুতি উভয়ই সমান।

আত্মদোষকীর্ত্তনে রসিয়ু বাইরণকেও পরাভব করিয়াছেন। রসিয়ু বাইরণের ন্যায় অভিমানে স্ফীত হইয়া লিখেন নাই। সংসার তাঁহাকে সরল বলিয়া ধন্য ধন্য করিবে, তিনি, এই লোভবশতঃই, আপনার সম্বন্ধে মানবজিহ্বার অবক্তব্য, মানবকর্ণের অশ্রোতব্য নানা কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর লোক এমনই ছলগ্রাহী, এত যে প্রকাশ করা হইয়াছে, তথাপি অনেকে বলে যে, রসিয়ু স্থানে স্থানে চন্দ্রবিন্দু চুরি করিতে ত্রুটি করেন নাই। ডাকাতি করিয়াছি, এমন কথা স্বীকার করিতে অনেকের সঙ্কোচ হয় না। স্বচরিত্রে চৌর্য্যদোষের সংস্পর্শ থাকিলে, সেটুকু যত্নের সহিত আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে প্রবৃত্তি হয়। রসিয়ুর স্বলিখিত জীবনবৃত্তে অবিশ্বাসীরা এই দোষ আরোপণ করেন। তাঁহাদিগের এই সংস্কার যে, তিনি স্বকীয় চরিত্রের যে সকল দোষকে বিশেষ দোষ বিবেচনা করেন নাই, তৎসমুদয়ই অক্ষুব্ধমনে বর্ণনা করিয়াছেন। যেগুলিকে তাঁহার নিজ মনেই একান্ত অপমানজনক বলিয়া বোধ ছিল, তাহার আবরণ যেমন ছিল, তেমনই রহিয়াছে।

অল্পদিন হইল, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের স্বরচিত জীবনবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছে। অধুনাতন অনেক লোকেই তাঁহাকে বুদ্ধিগত ক্ষমতা বিষয়ে অসাধারণ মনুষ্য মনে করিয়া থাকেন। মিল আপনিও আপনাকে অসাধারণ মনে করিতেন, এইরূপ বিশ্বাস করিবার বিস্তর কারণ রহিয়াছে। তাঁহার চরিত্র যে, সর্ব্বাংশে না হউক, অনেক অংশে তদীয় বুদ্ধির অনুরূপ ছিল, ইহাতেও সংশয় হইতে পারে না। তথাপি বোধ হয়, আপনার কাহিনী

আপনি বলিবার সময়, অন্যান্য ব্যক্তিরা যে দোষে নিপতিত হইয়াছেন, মিলও তাহা হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। হিতবাদিসম্প্রদায়ের আদিপ্রবর্ত্তক জেরিমি বেন্থামের নিকট মিলেরা পিতাপুত্রে অনেক বিষয়ে বিশেষরূপে ঋণী ছিলেন। মিল বেন্থামের প্রতি কোন অংশে অকৃতজ্ঞের ভাব প্রকাশ করেন নাই। অথচ বেন্থামের ঋণ পরিশোধের জন্য, হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া যে সকল কথা স্পষ্ট উল্লেখ করা উচিত ছিল, বোধ হয়, তাহার অনেক অনুল্লিখিত রহিয়াছে। বেন্থামের চরিতাখ্যায়ক, মিল এবং মিলের পিতাকে ক্ষমতা ও চরিত্র বিষয়ে যে স্থান প্রদান করিয়াছেন, মিল আপনাকে আপনি এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার পিতাকেও তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থানে তুলিতে যত্ন করিয়াছেন। বুদ্ধি অসাধারণ হইলেই যে, স্বগুণপক্ষপাতিতা তিরোহিত হয়, এমন নহে। জীবিত মনুষ্য স্তুতির মোহনকণ্ঠে বিমোহিত হয়। মুমূর্ষু মনুষ্য এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি পায়, ইহা কে বলিবে?

আপনার জীবন আপনি লিখিলেই যদি এত দোষ ঘটে, উহা পরের লেখনীদ্বারা আলিখিত হইলে, কত অপূর্ণতা থাকিয়া যায়, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। মনুষ্য আপনার চক্ষে এক, পরের চক্ষে আর। সে যতক্ষণ একাকী, ততক্ষণ সরল। যেই তাহার উপর পরের দৃষ্টি পড়িল, অমনি কপটতার সুদৃঢ় আবরণে তাহার তনু আবৃত হইল। ইহা মনুষ্যের স্বভাবের দোষ নহে, মানবসমাজের অনুল্লঙ্ঘনীয় শাসনের ফল। সর্ব্বতোভাবে সরল ব্যক্তি মানবসমাজে একদিনও তিষ্ঠিতে পারে কি না সন্দেহ। ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে এইরূপ একটা কথা প্রচলিত আছে যে, শয়নঘরের সেবকের নিকট কোন মহাত্মাই দেবতা নহেন। কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত ইহাও

বলিয়াছেন,—যদি কাহারও স্বভাবের অনুসন্ধান করিতে চাও, তাহার ভৃত্যের নিকট জিজ্ঞাসা কর। এই সমস্ত প্রচলিত কথার অর্থ বড়ই গভীর। লোক, আপনা হইতে উচ্চ কিম্বা আপনার সমানব্যক্তির সন্নিধানে গমন করিবার সময় যেমন ভাল বস্ত্রাদি ব্যবহার করে, সেইরূপ স্বকীয় স্বভাবের উপরও ভাল একখানি আবরণ দিয়া যায়। ঘরে যখন সে একাকী উপবিষ্ট থাকে, যখন সেবক ব্যতীত অন্য কেহ তাহার নিকট যাতায়াত করিতে পারে না, তখন বস্ত্রাদির উপরও তাহার মনোযোগ থাকে না, স্বভাবের বহিরাবরণ বিষয়েও, সে তত সাবধান রহে না।

চরিতাখ্যায়কেরা প্রায়শঃই বহিঃস্থ ব্যক্তি। তাঁহারা বাহির হইতে উঁকি মারিয়া, যৎকিঞ্চিৎ যাহা দেখিতে পান, তাহার সঙ্গে কল্পনার কোটি কথা মিশাইয়া বাস্তব এবং অবাস্তব উভয়-বিধ উপকরণ দিয়া, এক অদ্ভুত বস্তু সৃজন করেন। কোন্ কথা বলিলে লোকের মনে বিস্ময়রসের সঞ্চার হইবে, কিসে সংসার মুগ্ধ এবং গ্রন্থের অধিকৃত ব্যক্তির প্রতি মনুষ্যের চক্ষু আকৃষ্ট হইবে, এ বিষয়ে যে পরিমাণে যত্ন থাকে, বোধ হয়, অমিশ্র সত্য প্রকাশের জন্য তাঁহাদিগের তেমন যত্ন হইয়া উঠে না।

চরিতাখ্যায়কদিগের মধ্যে অনেকে—ভক্ত। ভক্তের মন মৃত মহাত্মার গুণরাশি স্মরণ করিয়া ভক্তির তরঙ্গে নাচিতে থাকে; দোষভাগের প্রতি ভুলিয়াও দৃষ্টিপাত করে না। অনেকে স্নেহানুরক্ত। স্নেহ মনুষ্যের চক্ষে কিরূপ ধূলি নিক্ষেপ করে, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। পুত্র কি কন্যা পরলোকগত পিতার জীবনবৃত্ত লিখিতে উপবিষ্ট হইলে অথবা পত্নী সংসারের নিকট মৃত পতির পরিচয় প্রদানের উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিলে, তাঁহাদিগের উদ্বেল হৃদয় কত দিকে প্রবাহিত হয়,

তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া কত ভ্রমে নিপতিত হন, তাহা হৃদয়ালু ব্যক্তিমাত্রই অনুভব করিতে পারেন। অনেকে ভক্তি স্নেহের শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইলেও, সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি অনুরাগনিবন্ধন অন্ধ হইয়া পড়েন। ক্রম্‌ওয়েলের জীবনচরিত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন কোন লেখক ক্রম্‌ওয়েলকে দেবতা হইতেও বড় বলিয়া বর্ণনা করেন; কেহ কেহ আবার দস্যুর সহিত তাঁহার তুলনা দিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। লেখকদিগের রুচি ও প্রবৃত্তির বৈষম্য নিবন্ধনও অনেক স্থলে একই ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে বর্ণনার বৈষম্য ঘটিয়া উঠে। অনেকের জীবনচরিত হইতেই এ কথার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। আমরা, তাহা না করিয়া, কাব্য হইতে একটি উদাহরণ দিতেছি। শকুন্তলার নাম ও চরিত্রের সহিত পরিচয় না আছে, এদেশে তাদৃশ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু ব্যাসের শকুন্তলা এবং কালিদাসের শকুন্তলা একস্থলে দণ্ডায়মান হইলে, ইনিই যে উনি, এইরূপ অবধারণ করা, অনেকের পক্ষেই কঠিন হয়। ব্যাসের শকুন্তলা পরুষাক্ষরভাষিণী প্রগল্‌ভস্বভাবা তাপসী—কথার কথা কাটিতে সঙ্কোচ নাই, রাজা বলিয়া ভ্রূক্ষেপ নাই, লোকে কি কহিবে, কি না কহিবে, তৎপ্রতি অণুমাত্রও দৃষ্টি নাই। কবির মানসকাননের শকুন্তলা লতার ন্যায় কোমলা, নিঃশ্বাসের ভরও সয় না, আপনার তনুতে আপনি আবৃত। এইরূপ চরিতাখ্যায়কদিগের মধ্যে যাঁহারা ওজোগুণসম্পন্ন, তাঁহাদিগের লেখনীর গুণে অনেক দীনসত্ত্ব ব্যক্তিও ওজস্বল বলিয়া প্রতিভাত হন এবং সময়ে সময়ে যথার্থ বীরপুরুষেরাও, কাপুরুষের হাতে পড়িয়া, কাপুরুষের পংক্তিতে মিশিয়া যান।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের কোন মহাত্মাই আপনার জীবনচরিত, আপনি লিখিয়া যান নাই। ভারত-

বর্ষবাসীরা পরের জীবনচরিত লিখিতেও জানিতেন না। তাঁহারা কবিতার কলকূজন শ্রবণেই মোহিত থাকিতেন। আর কোন-দিকেই চিত্ত প্রেরণ করিতে অবসর পাইতেন না। শাক্য সিংহ, শঙ্করাচার্য্য এবং চৈতন্যদেব প্রভৃতি কতিপয় সাধুপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত অংশতঃ সঙ্কলিত আছে। কিন্তু তাহাও ভক্তের হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়াছে। পারসিকেরা, এ বিষয়ে অপেক্ষা-কৃত উন্নত হইলেও প্রতিবেশীর সংসর্গদোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত নহেন। জীবনচরিত লেখার আড়ম্বর গ্রীসদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর পশ্চিমে। সে দিকে যত জনে অদ্য-পর্য্যন্ত লোকের জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে পণ্ডিত-দিগের সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে বস্‌ওয়েলই বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। পণ্ডিতেরা বলেন, বস্‌ওয়েল চরিতাখ্যায়কদিগের রাজা। তিনি জন্‌সনের সম্বন্ধে চরিতলেখকের কার্য্য করিতে গিয়া, চিত্রকরের কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার তুলিকায় সকলই উঠিয়াছে। আমরা যদিও বস্‌ওয়েলের চিত্রনৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করিতে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রস্তুত থাকি, তথাপি মানব-প্রকৃতি স্মরণ করিয়া,ইহা না বলিয়া থাকিতে পারি না যে, যথাযথ বর্ণনা বিষয়ে বস্‌ওয়েলও সকল সময়ে কৃতকার্য্য হন নাই। বস্‌-ওয়েল,জন্‌সনের আত্মার ভারে একেবারে অভিভূত ছিলেন। তিনি স্বপ্নেও জন্‌সন বিনা আর কিছু দেখিতে পাইতেন না। দুর্ব্বল-স্বভাবা কুমারীরা যেরূপ ভূতাবিষ্ট হইয়া থাকে, তিনিও সেই-রূপ জন্‌সনকর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই গুণেই তিনি অভীপ্সিত ফললাভে সমর্থ হইয়াছেন; অথচ এই গুণই আবার তাঁহার প্রধান দোষ। জন্‌সনের সহিত অপরের তুলনা করিবার কালে, তাঁহার ন্যায়-অন্যায়-বোধ থাকিত না; এবং তাদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ের মর্ম্মোদ্‌ঘাটনের জন্য যেরূপ বুদ্ধি আবশ্যক, তাহাও

তাঁহার ছিল না। তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি জন্‌সনের নিকটবর্ত্তী হইলেই স্তম্ভিত হইত। ওদিকে জন্‌সন যতই সাধু হউন, তিনি বস্‌ওয়েলকে তাঁহার চরিতাখ্যায়ক বলিয়া জানিতেন। বস্‌ওয়েল তাঁহার মুখের কথা, নয়নের ভঙ্গি, তাঁহার হাস্য, তাঁহার ক্রোধ সমস্তই গ্রন্থবদ্ধ করিতে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, ইহা সর্ব্বদা তাঁহার মনে জাগিত। মনে প্রতিক্ষণে এইরূপ ধারণা থাকিলে, কাহারও যথার্থ জীবন প্রকটিত হয় কি না, তৎসম্বন্ধে হাঁ কি না বলা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।

জীবনচরিত পাঠের ফল সম্বন্ধে লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত। কেহ বলেন, জীবনচরিত মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের শাখাবিশেষ। মানবপ্রকৃতির মর্ম্মপরিগ্রহ করা মনোবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য, এবং ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের জীবনগ্রন্থ সমালোচনা দ্বারাই সেই উদ্দেশ্য সুচারুরূপে সংসিদ্ধ হয়। মানবমন অঙ্কুরিত অবস্থায় কিরূপ থাকে, উহার বৃত্তিসমুদয় কুসুমের ন্যায় ক্রমে ক্রমে কিরূপে বিকসিত হয়, মনুষ্য কি অভিলাষে কোন্ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এবং তাহার হৃদয়যন্ত্রের কোন্ অঙ্গ স্পর্শ করিলে, কখন্ কি বাদ্য বাজিয়া উঠে, ইত্যাদি সমস্ত তত্ত্বই তাঁহারা জীবনচরিত পাঠ করিয়া, সঙ্কলন করিতে ইচ্ছা করে। মনুষ্যের যথার্থ জীবনবৃত্ত গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে, এই উদ্দেশ্য কেন, ইহা হইতে মহত্তর উদ্দেশ্যও জীবনচরিত পাঠেই সম্পন্ন হইত। কিন্তু, জগতে যে প্রণালীতে মনুষ্য, মনুষ্যের জীবন পাঠ করে, এবং পাঠ করিয়া লিপিবদ্ধ করে, তদ্দ্বারা তাদৃশ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে কি না, ইহা বস্তুতঃই চিন্তনীয়। বৈজ্ঞানিক, স্বকীয় ব্রত বিস্মৃত হইয়া, কবির কল্পনা ও বীণা লইয়া উপবেশন করিলে, না বুদ্ধিই ভোজ্য লাভ করে, না হৃদয়ই দ্রবীভূত হয়। যাহা হউক, এত অপূর্ণতা সত্ত্বেও আমরা মনুষ্যের জীবনচরিতে উপেক্ষা

প্রদর্শন করিতে পারি না। ইতিহাসশাস্ত্র এই দোষে দূষিত, তথাপি ইতিহাস জগতের অপরিসীম উপকার সংসাধন করিতেছে। জীবনচরিতশাস্ত্র, এই দোষে দূষিত হইলেও, তীক্ষ্ণ আলোচনা দ্বারা যথাসম্ভব শোধিত হইয়া, জগতের অশেষ উপকার সংসাধন করিবে। ইতিহাস মানবজাতির জীবনচরিত; জীবনচরিত মনুষ্য বিশেষের ইতিহাস। যেমন ইতিহাস, প্রাচীন পিতামহের ন্যায়, জগতের ভূত কথার প্রস্তাব করিয়া, মানবজাতির নির্ব্বাণোন্মুখ আশার উদ্দীপন করে,—কোন্ জাতি উন্নতির সোপানে ক্রমে ক্রমে কিরূপে উঠিল, ক্রমে আবার কি হেতু জলে জলবুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইল, তাহা কহিয়া নিয়ত শিক্ষা দেয়; মনুষ্যের জীবনচরিতও মনুষ্যকে সেইরূপ উৎসাহ ও উপদেশ প্রদান করে। জাতীয় কাহিনী ব্যক্তিকে জাগরিত করিতে না পারিলেও ব্যক্তিবিশেষের কাহিনী অবশ্যই ব্যক্তিবিশেষের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়; সেই সুখ, সেই দুঃখ, সেই আশা, সেই উদ্যম, সেই উত্থান ও পতন; কেবল আধারের ভেদ।

নিন্দুকের এত নিন্দা কেন?



এ দেশের এক প্রাচীন নীতিপ্রবক্তা এইরূপ বলিয়াছেন যে, পৃথিবী সকল ভার সহিতে পারেন, নিন্দুকের ভার সহিতে পারেন না। নিন্দুক পর্ব্বত ও সমুদ্র হইতেও দুর্ব্বহ। আবার সকল নীতিপ্রবক্তার শিরোমণি মহামনা সেক্ষপীরও নিন্দুকের নিন্দাচ্ছলে অতি মর্ম্মস্পর্শবাক্যে এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন যে,—

"যে আমার ধনরাশি অপহরণ করে, সে আমার কিছুই অপহরণ করে না। উহা অবস্তুমধ্যে পরিগণনীয়। উহা আমার ছিল, এইক্ষণ তাহার হইল, এবং পূর্ব্বেও উহা সহস্র সহস্র লোকের ভোগে আসিয়াছিল। কিন্তু যে আমা হইতে আমার সুনামটি অপহরণ করে, সে আপনি ধনী হয় না, অথচ আমায় প্রকৃতই দরিদ্র করে।"

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, সমাজে সকলেই নিন্দুকের উপর খড়্গাহস্ত; সকলেই নিন্দুককে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করেন। নিন্দুকের জিহ্বার নাম বিষ, নিন্দুকের সাহচর্য্যের নাম নরক, নিন্দুকের কথোপকথনের নাম ভাষার কলঙ্ক। ইহা কেন? নিন্দা যদি এমনই এক মহাপাতক, তবে এ পাপে কে না লিপ্ত? মনুষ্যনিবাসে কে না পরের নিন্দা করে? মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের যত যত বিষয়ে আলাপ হয়, তাহার প্রধান এক ভাগই কি পরনিন্দা নহে? দুখানি জিহ্বা আর চারিটী কর্ণ একস্থানে হইলেই

প্রায়শঃ একজন না একজনের নিন্দাবাদ আরম্ভ হয়, ইহা কি অস্বীকার করিবার কথা ?

আর একপ্রকারে দেখিতে গেলে নিন্দা অপরিহার্য্য। তুমি এই সংসারে যে কোন কার্য্যে লিপ্ত হও, তাহাতেই তোমাকে অল্প অধিক পরিমাণে নিন্দুক হইতে হইবে। যাঁহারা ধর্ম্মসংস্কারক, কি কোন বিশেষ সত্যের প্রচারক, তাঁহারা সকলেই নিন্দুকের অগ্রগণ্য। সম্প্রদায় বিশেষের নিগ্রহ বিনা, সাম্প্রদায়িক বিজয়পতাকা কোন দেশে উড্ডীন হয় নাই। লোকে লূথরের কতই না প্রশংসা করে ; কিন্তু বিচারতঃ তাঁহার প্রধান প্রশংসা এই যে, পোপ এবং পোপের শিষ্যবর্গকে নিন্দা করিবার সময়ে, তিনি একাই একসহস্র জিহ্বা এবং সহস্রাধিক ভেরীর কার্য্য করিতেন। ক্যাথলিকগণ যেখানে তাঁহার একগুণ নিন্দা করিতেন, তিনি সেখানে অযুতগুণে তাঁহাদিগের নিন্দা করিয়া ঋণ পরিশোধে যত্ন পাইতেন। এইরূপ ঐতিহাসিক, এইরূপ চরিতাখ্যায়ক, এইরূপ রাজনীতিবেত্তা এবং এইরূপ সংবাদপত্রাদির সম্পাদক ও সাহিত্যসমালোচক। কেহ লোকান্তরবাসী রাজা ও রাজমহিষী এবং মৃত গ্রন্থকারদিগকে মন্ত্রবলে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তাঁহাদিগের উপর নিদারুণ কশাঘাত করিতেছেন ;—কেহ জীবিত রাজপুরুষ, জীবিত গ্রন্থকার অথবা অন্য কোন শ্রেণীর জীবিত প্রধান ব্যক্তিদিগকে ক্রীড়াপুত্তলের মত নির্জ্জীব বিবেচনায় যথেচ্ছ গালি দিতেছেন। অধিক আর কি, কল্পনামাত্র যাঁহাদিগের সম্বল, সেই কবিগণও অতি সূক্ষ্ম কৌশলে লোকের নিন্দা করিয়া জগতে নিন্দার সার্থকতা দেখাইতেছেন। যখন সকলেই এই প্রকার কাহারও না কাহারও নিন্দা করিতে বাধ্য হইতেছেন, বল তবে নিন্দুকের আর নিন্দা করিব কেন ?

এই প্রশ্নটি প্রথমে যত সহজ বোধ হয়, বস্তুতঃ তত সহজ

নহে। ইহার প্রত্যুত্তরে অনেক কূট কথার আন্দোলন হইতে পারে। আমরা তথাপি সহজপথ অবলম্বন করিতেই চেষ্টা করিব।

আমাদিগের বিবেচনায় স্তুতি ও নিন্দা উভয়েরই সীমারেখা সত্য। সত্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া স্তুতি করিবে না, এবং সত্য উল্লঙ্ঘন করিয়া কখনও কাহারও নিন্দা করিবে না। কিন্তু যদিও একমাত্র সত্যই এই উভয়ের শেষ সীমা, কিন্তু একমাত্র কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতেই উভয়ের প্রবর্ত্তনা নহে। মনুষ্য প্রণয়ের অধীন হইয়া, প্রিয়জনের স্তুতিবাদ করিতে পারে, ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া, ভক্তিভাজনের গুণানুবাদ করিতে পারে। তাদৃশ স্থলে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা হইলেই হইল। আমরা তখন স্তুতি ও গুণানুবাদের প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব না। উদ্বেল-হৃদয় অন্তদীয় হৃদয়ের প্রতি প্রধাবিত হইলে, তাহাতে সংসারের সুখসমষ্টির হ্রাস হয় না, বরং বৃদ্ধি হয়। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে ও বিনা বিবেক ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির শাসনে, মনুষ্য মনুষ্যের নিন্দা করিতে অধিকারী নহে। নিন্দা গরল; চিকিৎসক যেমন শুধু ঔষধার্থেই গরল ব্যবহার করিতে পারেন, উহা লইয়া খেলা করিতে পারেন না, যাঁহারা বিশেষ কোন মনুষ্য, কি বিশেষ কোন সমাজের উপকার করিতে চাহেন, তাঁহারাও শুদ্ধ সেই এক প্রয়োজনেই নিন্দার ব্যবহার করিতে পারেন, উহা লইয়া খেলা করিতে তাঁহাদিগের অধিকার নাই। তাঁহাদিগের কথা কেবল সত্য হইলেই হইবে না, কিন্তু যে কথা তাঁহারা বলিতেছেন, তাহাতে প্রয়োজন এবং ন্যায়পরতার শাসনও আছে কি না, তাহাও প্রগাঢ় দৃষ্টিতে দর্শন করিতে হইবে। যাহারা নিন্দুক বলিয়া পরিচিত, সাধারণ্যে তাহাদিগের যে এত নিন্দা, ইহাই তাহার এক প্রধান হেতু। তবে নিন্দারও প্রকার আছে, প্রকৃতি

আছে, এবং যেখানে উহার অন্তস্তলে বিবেক নাই, সেখানে অন্য কোন গূঢ় কারণ আছে। কেহ আহূত নিন্দুক, কেহ অনাহূত নিন্দুক, কেহ বা রবাহূত নিন্দুক*। নিন্দুককে কি পরিমাণে নিন্দা করিতে হইবে, তাহা অবধারণ করিবার পূর্ব্বে সেই প্রকার, প্রকৃতি ও কারণের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক।

নিন্দার এক কারণ সহানুভূতির অভাব। যাহার সহিত তোমার মতে মিলে না, হৃদয়ে মিলে না, তুমি তাহার নিন্দা কর এবং সেও তোমার নিন্দা করে। তাহার আত্মা তোমার নিকট এক গভীর অন্ধকার কূপ, তোমার আত্মাও তাহার নিকট এক গভীর অন্ধকার কূপ। দুইয়েই দুইয়ের বহিরাবরণ মাত্র দেখিয়া থাক, এবং শুদ্ধ বহিরাবরণ দেখ বলিয়াই, দুইয়ে, দুইয়ের সম্বন্ধে একে আর এক অর্থ কর। সাম্প্রদায়িকদিগের পরস্পর নিন্দা এই শ্রেণির,—যাহাদিগের মধ্যে অবস্থার পার্থক্য নিতান্ত বৃহৎ, তাহাদিগের পরস্পর নিন্দাও এই শ্রেণির, এবং বৃদ্ধ ও যুবজনের যে পরস্পর নিন্দা হইয়া থাকে, তাহাও প্রধানতঃ এই শ্রেণির। বৃদ্ধ, যুবার প্রতপ্ত ও প্রমত্ত হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারেন না—সে কেন হাসে, কেন কাঁদে, সে কি উৎসাহে উৎসাহিত হয়, কি দুঃখে ঢুলিয়া পড়ে, তিনি কোন দিন বুঝিয়া থাকিলেও, এখন আর তাহা বুঝেন না।

* যাহাদিগকে সদসৎ সমালোচনের জন্য আহ্বান করা হয় অথবা লোকে স্বকৃত কর্ম্মের দ্বারা ডাকিয়া আনে, তাহাদিগকে আহূত নিন্দুক বলি, যাহাদিগকে কেহ ডাকিয়া আনে নাই, জিজ্ঞাসা করে নাই, অথবা নিন্দার বিষয়ের সঙ্গে যাহাদিগের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই, তাহারা অনাহূত অথবা অনিমন্ত্রিত নিন্দুক। আর যাহারা পরের যশোধ্বনি অথবা সুখ্যাতির রব শুনিয়া, আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা রবাহূত নিন্দুক।

আবার, যুবজনেরা বৃদ্ধের শীতসঙ্কুচিত সাবধান প্রাণের মর্ম্মস্থান দর্শন করিতে সমর্থ হন না। তাঁহারা এক পা অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে কেন শতবার চিন্তা করেন, তাহাদিগের তরল বুদ্ধিতে প্রবেশ করে না। সহানুভূতির অভাবে কিরূপে নিন্দার সৃষ্টি হয়, আমরা তাহার প্রকারমাত্র দেখাইয়া দিলাম। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ইহা হইতেই বহুবিধ কথার তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারিবেন। সহানুভূতির অভাবমূলক নিন্দা কথঞ্চিৎ সহনীয়। কারণ, ইহার অভ্যন্তরে খলতার ভাগ অত্যল্প। ইহা অনাহূত হইলেও ক্ষমাযোগ্য।

নিন্দার আর এক কারণ শক্তির অভাব অথবা অক্ষমতা। অশক্ত ও অধম ব্যক্তিরা আপনা হইতে উচ্চতর ব্যক্তিদিগের নিকটে পঁহুছিতে পারে না,—তাঁহারা চিন্তার যে গ্রামে অবস্থান করেন, কল্পনার সহায়তায় যেখানে উড্ডীন রহেন, সেখানে উঠিতে সামর্থ্য পায় না, এবং সুতরাং তাঁহারা কেন কি করেন, তাহা ইহাদিগের নিকট কার্য্য ও কারণের শৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ বলিয়াই প্রতীয়মান হয় না। তাঁহাদিগের অতি সুন্দর কার্য্যও ইহাদিগের নিকট সুন্দর দেখায় না। ইহারা এই নিমিত্তই কৃপাপাত্র। পৃথিবীর এক অসাধারণ পুরুষ মরণমুহূর্ত্তেও এই শ্রেণির নিন্দুক ও অত্যাচারিদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারিয়াছিলেন।

আপাততঃ এইরূপ বোধ হইতে পারে যে, যাহারা শক্তির অভাব কি ন্যূনতাহেতু নিন্দুক, তাহাদিগের দ্বারা সমাজের অনিষ্টসাধন হয়; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা হয় না। স্বাভাবিকী প্রতিভা, প্রথমতঃ যত কেন প্রচ্ছন্ন থাকুক না, উহা পাবকতুল্য। তৃণরাশি কখনও উহাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। তৃণ আপনিই দগ্ধ হইয়া যায়। শক্তি ও অশক্তিতে, আলোকে ও

অন্ধকারে, জ্ঞানে ও অজ্ঞতায়, এবং পুরুষে ও অপুরুষে যেখানে বিরোধ হইয়াছে, ইতিহাসে সেখানেই এই কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

নিন্দার তৃতীয় কারণ অতৃপ্ত ক্রোধ। ক্রোধ জিঘাংসার অপক্ক ফল। কাহারও সম্বন্ধে মনে ক্রোধ জন্মিলে, স্বভাবতঃই তাহার অনিষ্ট সংসাধনে প্রবৃত্তি জন্মে। যেখানে সে প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, সেখানকার পরিণাম নিন্দাবাদ। যদি কাহারও আচারে কি ব্যবহারে অথবা কোন কথায় আমাদিগের অভিমান আহত হয়, এবং সেই আহত অভিমান, আহত সর্পের ন্যায়, তাহাকে ফিরিয়া দংশন করিতে না পারে, তাহা হইলেই আমরা সেই ব্যক্তির নিন্দা করিয়া থাকি। এই প্রবন্ধে নিন্দার যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার অনেকটিই এই শ্রেণিতে স্থান পাইবে। আর, সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন ব্যক্তিরা যে হীনাবস্থ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক অনেক সময়ে নিন্দিত হইয়া থাকেন, তাহারও কারণ এই বলিতে হইবে। নীতিনিপুণ পণ্ডিতেরা এই জন্যই উপদেশ করিয়াছেন যে, কাহারও অভিমানে অকারণে আঘাত করিও না, কাহারও ক্রোধাগ্নিতেও বিনা প্রয়োজনে ঘৃতাহুতি দিও না। ইহা ন্যায়ের চক্ষে অসহ্য, ইহা দয়ার চক্ষে নিষ্ঠুরের কার্য্য, ইহা বুদ্ধির চক্ষে অশুভকর। যাহারা আহত হইয়া নিন্দা করে, তাহারা আহূত নিন্দুক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কারণ, তাহারা কথায় আহূত না হইলেও কর্ম্ম দ্বারা আহূত।

নিন্দার চতুর্থ কারণ জাতীয় বিদ্বেষ। ইহার অভ্যন্তরে সহানুভূতির অভাব আছে, অজ্ঞতা আছে, এবং তদতিরিক্ত বিদ্বেষ আছে। ইহাও আহূত মধ্যেই পরিগণনীয়। এই বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়াই ফরাশি, প্রুশীয়ানের সর্ব্বাঙ্গে কালিমা দেখেন,

এবং ইহারই প্রণোদনায় পুশীয়ার পরমধার্ম্মিক ব্যক্তিও ফরাশির নিন্দাবাদে জিহ্বাকে কলুষিত করেন। ইহার আরও অনেক দৃষ্টান্ত অঙ্গুলিনির্দ্দেশ সহকারে প্রদর্শন করিতে পারি; কিন্তু চক্ষুষ্মানের জন্য তাহা অনাবশ্যক।

নিন্দার পঞ্চম ও শেষ কারণ পরশ্রীকাতরতা। ইহাকে স্বশ্রীকাতরতা বলিলেও ভাষায় গুরুতর দোষ ঘটে না। কেননা ইহা স্বজাতি ও পরজাতির মধ্যে স্বজাতীয় ও সন্নিহিত প্রতিবেশীকেই বিশেষতঃ লক্ষ্য করে, এবং বলিব কি—ইহা দূর সম্পর্কিত অপেক্ষা নিকট সম্পর্কিতকে, যথার্থ পর অপেক্ষা মনগড়া পর—আপনার জনকেই বরং অধিকতর স্পর্শ করে। নিন্দার অন্য অন্য কারণ সম্বন্ধে যে কোন কথাই কেন বল না, বোধ হয়, যুক্তির কোনরূপ আকুঞ্চনেই পরশ্রীকাতরতামূলক জঘন্য নিন্দাবাদের পক্ষ সমর্থন করা সম্ভব হইবে না। যাহারা পরশ্রীকাতরতার বিষমজ্বালায় দগ্ধ হইয়া, স্বদেশীয় কি স্বজাতীয় উন্নত ব্যক্তিদিগের অনর্থক নিন্দা করে, যেখানে অমৃতের প্রত্যাশা, সেখানে গরল ঢালিয়া দেয়, সম্মুখে স্তুতিবাদ করিয়া, পরোক্ষে আঘাত করিতে থাকে, তাহারা যেমন খলস্বভাব, তেমনই ক্ষুদ্রপ্রাণ। যদি নিন্দুক শব্দের কিছুমাত্র অর্থ থাকে, তবে ইহারাই সেই নিন্দুক। ইহারা জ্যোৎস্না দেখিলেই চক্ষু মুদিয়া রহে, এবং সমস্ত দিনও যদি ইহারা প্রফুল্ল কুসুমকাননে পরিচারণ করে, তথাপি ইহারা করে কতিপয় কণ্টকমাত্র লইয়াই গৃহে প্রত্যাগত হয়। ইহারাই প্রকৃত রবাহূত নিন্দুক। অভ্যুদয়ই ইহাদিগের চক্ষে অপরাধ এবং উন্নতিই ইহাদিগের চক্ষে পাপ। ইহারা অভিমানশূন্য,—কারণ, যেখানে অভিমান আছে, সেখানে বিনা আঘাতে পরকীয় সমৃদ্ধিতে কাতরতা হয় না। ইহারা কাপুরুষ —কারণ যেখানে পৌরুষ-তেজস্বিতার কণিকা মাত্রও বিদ্যমান

থাকে, সেখানে অন্যদীয় শক্তি, সামর্থ্য ও সম্পদরাশিতে আনন্দ বই কখনও ঈর্ষা ও অন্তর্দাহ জন্মে না।

মনুষ্যসমাজে অদ্যাপি নিন্দায় কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও ন্যায়পরতায় একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়াই মনুষ্য মনুষ্যের নিন্দা করে না। যেদিন তাহা হইবে, সে দিন মনুষ্যসমাজে অর্দ্ধেক দুঃখভার কমিয়া যাইবে।

ভালবাসা

ভালবাসা এক মহাযজ্ঞ; এ যজ্ঞের আহুতি স্বার্থ, এ যজ্ঞের দক্ষিণা মান। যেখানে স্বার্থ রক্ষা করিতে চাও, সেখানে ভালবাসিতে চেষ্টা করিও না; যেখানে মানে মানে রহিতে অভিলাষী হও, সেখানেও ভালবাসা দেখাইও না।

অনেকেই অনেকের সহিত ভালবাসা আছে বলিয়া গৌরব করেন, এবং ভালবাসা প্রসঙ্গে শতমুখে শতকথা বলেন। কিন্তু ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা অন্তরে অনুভব করা দূরে থাকুক, ক্ষণকালও তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। যেমন সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত, তেমন ভাষারূপ অনন্তজলধি মন্থন করিয়া ভালবাসা। মনুষ্যের ভাষায় ইহা অপেক্ষা মিষ্টতর শব্দ নাই, মনুষ্যের কল্পনা কি ভোগের জন্যও ইহা অপেক্ষা মহত্তর সামগ্রী নাই। তুমি আমি স্বার্থের দাস, মানের ভিখারী, আমরা কিরূপে ভালবাসিব? যিনি ভালবাসিতে পারেন, তিনি মহাযোগী, মহাদেব; তাঁহার পদরেণু স্পর্শ করিতে পারিলেও আমি আমাকে কৃতার্থ মনে করি।

দয়া আর ভালবাসা এক কথা নহে। আমরা অনেককে দয়া করি, কিন্তু ভালবাসি না। তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া আর্দ্রচিত্ত হই, অশ্রুমোচন করি, এবং উপকার পক্ষেও সাধ্যানুরূপ যত্নশীল রহি; অথচ তাহাদিগকে হৃদয়ের অভ্যন্তরে আনিয়া পুষিতে চাহি না। তাহাদিগের অতিনিকটস্থ হইলেও আপনাকে দূরস্থ বলিয়া মনে করি, এবং মিশিবার জন্য শত চেষ্টা

করিলেও আপনা হইতে ফিরিয়া আসি। তখন কে যেন কোথা হইতে পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ করে, এবং কি কারণে যেন মধ্যে এক বৃহৎ ব্যবধান আসিয়া উপস্থিত হয়। ভালবাসায় কি বিকর্ষণ ও ব্যবধান আছে? যে সকল দীনদুঃখীরা কোন দিন নানাবিধ পাপাচরণ করিয়া, এইক্ষণ রাজপথের উভয় পার্শ্বে উদরান্নের জন্য অনবরত চীৎকার করিতেছে, যে সকল বারবিলাসিনীরা এক সময়ে রূপযৌবন এবং নানাবিধ গুণপনার পণ্যবীথিকায় বাণিজ্য করিয়া, আজি কালের শাসনে হৃতসর্ব্বস্ব ও অস্পৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে, যাহাদিগের ললাটপট্টের প্রত্যেক রেখায় হিংসা, দ্বেষ ও অন্য অশেষবিধ দুষ্প্রবৃত্তির করলেখা অঙ্কিত রহিয়াছে,—অধিক আর কি, যাহারা দুদিন পূর্ব্বেও অকারণে তোমার অনিষ্ট চেষ্টা পাইয়াছে এবং মনুষ্যের সুখের পথে অপ্রয়োজনে কণ্টক দিয়াছে, যদি তোমার হৃদয় থাকে, তবে তুমি তাহাদিগকেও দয়া করিতে বাধ্য। বস্তুতঃ, তাহারাই দয়ার প্রকৃত পাত্র, এবং যে না তাহাদিগকে দয়া করে, সে আপনিই দয়ার্হ দীনাত্মা। কিন্তু, তাহাদিগকে যেমন দয়া করিতে পার, সেইরূপ কি ভালবাসিতেও পার?

কাম, অপত্যস্নেহ এবং আসঙ্গলিপ্সা প্রভৃতি দুর্নিবার পাশব প্রবৃত্তির প্রণোদনাতেও এক প্রকার ভালবাসা জন্মে। কিন্তু আমরা তাহাকেও যথার্থ ভালবাসা বলিতে সাহসী হই না। আদৌ, এ প্রকার প্রবৃত্তিজন্য ভালবাসায় সাগরাভিসারিণী বর্ষাকালীন স্রোতস্বিনীর বেগবত্তা থাকিলেও, স্বাধীনতা নাই। আত্মা ইহাতে আপনার হইয়া আপনি চলিতে পারে না, ইচ্ছা নিরঙ্কুশ বিহার করিতে সমর্থ হয় না। শৃগাল, কুক্কুর, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি যাবতীয় প্রাণীই ঈদৃশ ভালবাসার অধীন হইয়া, অহোরাত্র যন্ত্রবৎ চালিত হইতেছে, অথচ তাহারা

ইচ্ছা কি অনিচ্ছা কিছুই করিতেছে না। যেমন চালনা হইতেছে, তেমন তাহারা চলিতেছে, যেমন প্রেরণা হইতেছে, তেমন তাহারা প্রেরিত হইতেছে। যেই প্রবৃত্তির বিরাম, সেই আসক্তিরও বিরাম। তার পর কে আর কোথায়? যদি এই প্রকার ইচ্ছাসম্পর্কশূন্য অপকৃষ্ট অনুরাগকেও ভালবাসা নাম দিতে অভিলাষী হও, তবে জলের প্রতি তৃষ্ণাতুরের, অন্নের প্রতি বুভুক্ষুর এবং ভেকের প্রতি ভুজঙ্গেরও ভালবাসা আছে বলিতে অপরাধ কি?

উল্লিখিত প্রবৃত্তিচয় মনুষ্যহৃদয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নত। মনুষ্য শিক্ষা ও সভ্যতার মাহাত্ম্যে, উচ্চতর মনোবৃত্তিসমূহের ক্রমিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, যে পরিমাণে উন্নত হইয়া থাকে, মনুষ্যের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসকলও মার্জ্জনার পর পরিমার্জ্জনায়, সংস্কারের পর পুনঃসংস্কারে, সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণে উন্নতি লাভ করে। তখন স্মরান্ধতাও প্রীতির ন্যায় সুন্দর প্রতিভাত হয়, অন্ধ অপত্যস্নেহও অকৃত্রিম বাৎসল্যের মূর্ত্তি ধারণ করে, এবং যে প্রকার আসঙ্গলালসা কোন হেতুতেই ভালবাসার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না, তাহাও ভালবাসা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধির সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ইহাতে একবারে ভুলিয়া যাইবে কেন? দেখিয়াছি, মনুষ্য যাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে, যখন আর কেহ নিকটে না থাকে, তখন তাহাকে নিকটে পাইলেও সে আহ্লাদে অধীর হইয়া উঠে। ইহাও দেখিয়াছি, মনুষ্য প্রবৃত্তিবিশেষের অনুশাসনে এই মুহূর্ত্তে যাহাকে রত্নহার বলিয়া হৃদয়ে তুলিয়া লয়, পরমুহূর্ত্তেই তাহাকে কলঙ্কপঙ্কিল জঘন্য বস্তু জ্ঞানে, পাদদলিত কুসুম বিবেচনায়, দূরে ফেলিয়া পলায়ন করে। যেখানে স্বার্থানুসারিণী ভোগ-স্পৃহা এত বলবতী এবং স্বসুখের প্রতি এত দৃষ্টি, সেখানে কেমন করিয়া ভালবাসা থাকিতে

পারে? এ কথা মানি যে, অনেকে আগে সুখের জন্য কি ভোগের জন্য, অথবা অন্য কোন ক্ষণিক উত্তেজনায় কাহারও সহিত সম্পৃক্ত হয়; তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাহাকে ভালবাসিতে শিক্ষা করে; শেষে প্রাণের সহিত তাহাকে ভালবাসে। কিন্তু শুক্তিতে মুক্তা জন্মে বলিয়া, শুক্তি আর মুক্তা এক নহে, এবং পুষ্করিণীর কর্দ্দমময় আবিল জল হইতে নয়নবিনোদিনী ভুবনমোহিনী পদ্মিনী ফুটিয়া উঠে বলিয়া, ঐ কর্দ্দম আর ফুল্ল পদ্মিনীও অভিন্নভাবাপন্ন এক পদার্থ নহে।

কৃতজ্ঞতা এবং ভালবাসাতেও স্পষ্ট পার্থক্য আছে। উহা ভালবাসার অতিসন্নিহিত, তথাপি ভালবাসা হইতে বিভিন্ন। যদি কোন অশ্রদ্ধেয় মনুষ্যও নিয়ত তোমার উপকার করে, তুমি তাহার নিকট জন্মের মত কৃতজ্ঞ থাকিবে, এবং তদীয় প্রত্যুপকার সাধনের জন্য চিরদিন যত্নপর রহিবে। তবে, এইরূপ করিলেই ভালবাসা হয় কি না, তাহার সাক্ষী তোমার হৃদয়। হৃদয় কৃতজ্ঞতার দুর্ব্বহভারে অনেক সময়ে একবারে ঢুলিয়া পড়ে; কিন্তু প্রতিদানে আপনাকে অর্পণ করিতে পারে না বলিয়া, অহর্নিশ তুষানলে দগ্ধীভূত হইতে থাকে। উহার তদানীন্তন মুর্ম্মুরদাহ কেহ দেখিতে পায় না, কেহ অনুভব করিতেও সমর্থ হয় না। যদি তাহা কখনও প্রকাশিত হয়, সে প্রকাশ দীর্ঘনিঃশ্বাসে; যদি তাহা কখনও দৃশ্য হয়, সে দর্শন পরিম্লান মুখচ্ছবিতে। পৃথিবীতে অনেক ব্যক্তি পিতার স্নেহ-ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া, চিরকাল বিলাপ করিয়াছেন, অনেকে প্রসূতীর পদারবিন্দকে প্রীতিপবিত্র বাষ্পবারিতে বিধৌত করিতে না পারিয়া, কতই পরিতাপ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্যে যাহা থাকিলে, মনুষ্য তাহাকে ভালবাসিতে পারে, তাঁহারা পিতা কি প্রসূতীতে তাহা না দেখিয়া, কেবল দুঃখের

অন্তর্গূঢ় বিষদংশনই ভোগ করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতার ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতর সম্পর্ক কোথায় সম্ভবে?

এদেশে এখন আর পরিণয়ে স্বাধীনতা নাই, এবং প্রণয়ে পাণিদান বিষয়ে কুলকামিনীগণের আপনার উপর আপনার আধিপত্য নাই। তাঁহারা অভিভাবকগণ কর্তৃক ভোজ্যান্নের ন্যায় উৎসৃষ্ট হয়েন, এবং ভোজ্যান্নের মত ব্যবহার পাইলেই সর্ব্বথা চরিতার্থ রহেন। তাঁহারা পিঞ্জররুদ্ধ বিহঙ্গীর মত,—অল্প আশা, অল্প আকাঙ্ক্ষা এবং অল্প তৃষ্ণা; সুতরাং অতি অল্পেতেই তাঁহাদিগের পরিতৃপ্তি। কৃতজ্ঞতায় আর ভালবাসায় কত প্রভেদ, তাহা তাঁহারা কিরূপে বুঝিতে পারিবেন? এক মুষ্টি তণ্ডুল, কি একখানি স্বর্ণাভরণ পাইলেই যে আহ্লাদে অবশ হইয়া পড়ে, কদাচিৎ কোন সময়ে পতিমুখে কৃপার পরিচয় স্বরূপ একটি প্রিয় কথা শুনিলেই, যাহার হৃদয় অননুভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্যগর্ব্বে নাচিয়া উঠে, যে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তেই আদর ও অনাদর এবং অনুগ্রহ ও নিগ্রহের চঞ্চল-দোলায় দোলায়িত হইয়া থাকে, কাহারও প্রতি কৃতজ্ঞ হইলেই যে তাহাকে ভাল-বাসা হয় না, তাহার সংকীর্ণ অন্তঃকরণ কেমন করিয়া তাহা ধারণা করিতে সক্ষম হইবে? কিন্তু যে দেশে প্রণয়, পরিণয় ও আত্মসমর্পণ বিষয়ে মনুষ্যমাত্রেরই স্বাধীনতা আছে, সেখানে পুরসুন্দরীরা সকলেই এই পার্থক্য ও প্রভেদ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং বুঝিয়া গীতে, কাব্যে, উপন্যাসে ও অশ্রুজলে তাহার পরিচয় দিতেছেন।

প্রশংসার বিনিময়ে প্রশংসাদানে, এবং স্তুতির বিনিময়ে স্তুতিবাদপ্রদানেও এক প্রকার ভালবাসা জন্মিয়া থাকে। মনুষ্য যত কেন চেষ্টা করুক না, সে যশঃস্পৃহার অসহ্য কণ্ডূয়ন হইতে কখনই অব্যাহতি পাইবে না। শৈশবে উহা বালসহচরীর মত

তাহার সহিত ক্রীড়া করে, যৌবনের প্রমত্ততার সময়ে উহা তাহার হৃদয়ে আর এক প্রকার মদিরা ঢালিয়া দেয়, পৌঢ়াবস্থায় পরিণামচিন্তার দিনে উহা তাহাকে পুতুলের মত নৃত্য করায়, এবং বার্দ্ধক্যের চরমশয্যাতেও উহা তাহাকে সুখশীতল হস্তাবলম্ব দিয়া, ক্ষণকালের তরে উঠাইয়া বসায়। এমন যে যশঃস্পৃহা, ইহা যাহার দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করে, তাহাকে প্রিয়জ্ঞান হইলে, দুর্ব্বলচেতা মনুষ্যকে দোষী বলিব কেন ? যদি তুমি কর্ত্তব্যের কঠোরব্রত হইতে স্খলিত না হইয়া, হৃয়য়ের সহিত কাহারও প্রশংসা করিতে পার, সে অবশ্য তোমাকে ভালবাসিবে ; এবং যে ঐরূপ সাধুহৃদয়ে তোমার প্রশংসা করিতে পারিবে, তুমিও তাহাকে ভাল মনে করিবে। তাহার আত্মা তোমার অভিমান-বহ্নিতে ইন্ধন দিবে, এবং তুমিও তাহার অভিমানে উপযুক্ত ইন্ধন দান করিয়া, তদীয় সম্পর্ককে সম্মানকর বিবেচনায় আনন্দে স্ফীত হইবে। কিন্তু এরূপ ভালবাসা অকলঙ্ক হইলেও উচ্চতম শ্রেণির নহে, এবং ইহাতে মনুষ্যের মন ইহলোকেই স্বর্গের পূর্ব্বস্বাদ প্রাপ্ত হয় না।

যথার্থ ভালবাসা এই সকল ক্ষুদ্রভাবের বহু উর্দ্ধে অবস্থান করে। উহাতে দয়ার আর্দ্রতা আছে, উপেক্ষা নাই ; কামাদি সংযোজনী বৃত্তির প্রবল বেগবত্তা আছে, আবিলতা নাই ; কৃতজ্ঞতার নম্রতা আছে, নীরসতা নাই ; এবং অন্যোন্যস্তাবকতার দান আছে, প্রতিগ্রহ নাই। ফলাফল বিবেচনা, ক্ষতিলাভ গণনা এবং ভূতভবিষ্যদ্ভাবনা উহার জ্যোতির্ম্ময় নির্ম্মল সান্নিধ্যে কখনও পঁহুছিতে পারে না। যে ভালবাসে, তাহার পক্ষে অদ্য আর কল্য কি ? লাভ আর অলাভ কি ? এবং সুখ দুঃখই বা কি ? ভালবাসিয়া কি কেহ কোন দিন সুখী হইয়াছে ? না ভাল বাসিয়া কেহ কোন দিন প্রতিরোমপ্রসূত দুর্বিসহদুঃখকেও দুঃখ

বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে? যখন মহাত্মা ভবভূতি সীতাস্পর্শ-মুগ্ধ প্রেমবিহ্বল রামচন্দ্রের মুখে বলিয়াছিলেন যে,*—"এ আমার কি হইল! একি আমি সুখানুভব করিতেছি, না দুঃখে জর্জ্জরিত হইতেছি; একি আমি জাগরিত রহিয়াছি, না নিদ্রায় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি; একি আমার শরীরে বিষসঞ্চার হইতেছে, না মদধারা প্রবাহিত হইতেছে!" তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভালবাসা কি। যেমন মেঘাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলে প্রতিভাময়ী ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক চমক, তেমন মোহাচ্ছন্ন মনুষ্যমনে প্রীতির প্রাণগতরসস্বরূপ প্রকৃত ভালবাসার ক্ষণিক বিকাশ। উহা যাহার হৃদয়ে যতক্ষণ থাকে, সে অন্ততঃ ততক্ষণের জন্য দেবত্ব পায়, ততক্ষণ দিব্যচক্ষে দর্শন করে এবং জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, ততক্ষণ আপনার ভাবে আপনি পরিপূর্ণ রহে।

লোকে ভালবাসাকে অনুরাগ বলে, আমি উহাকে বৈরাগ্য বলি। ভালবাসা অনুরাগে বৈরাগ্য, বৈরাগ্যে অনুরাগ। যে ভালবাসে, সে নিষ্কাম, নিঃস্পৃহ, নিরিন্দ্রিয়। সে তৃপ্তির জন্য লালায়িত নহে, কারণ তাহার হৃদয়ে অনন্ত অতৃপ্তি। সে যাহা দেয়, তাহা পাইবার জন্য প্রত্যাশা করে না, এবং দিয়াও আপনি পরিতৃপ্ত হয় না। যদি তদীয় জীবনের বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত হইতে সেই সৃষ্টিবিপ্লাবক মহাপ্রলয় পর্য্যন্তও সে ভালবাসিতে পারে, তথাপি তাহার আকাঙ্ক্ষা ফুরায় না। কি ভয়ঙ্কর তৃষ্ণা! কি অচিন্তনীয় যাতনা! কে কুসুমদামসংস্থিত শিশিরবিন্দুর ন্যায় মনুষ্যের হৃদয়বিন্দুতে এই অনন্তের প্রতিমাকে প্রতিবিম্বিত

---

* "বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা;
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মমহি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো-
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥"

করিয়া রাখিল? কে তাহাকে সেই দুর্নিরীক্ষ্য অলৌকিক জগতের আভা মাত্র দেখাইয়া, হায়! এইরূপ উন্মাদিত করিল? প্রকৃতির মর্ম্মার্থদর্শী কবিগুরু সেক্ষপীয়র, কবি, প্রেমিক আর পাগল, এই তিনকে এক শ্রেণিতে নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কি কবিত্ব, কি প্রেমিকতা, আর কি প্রমত্তহৃদয়তাই প্রদর্শিত হইয়াছে! কবি প্রকৃতিকে ভালবাসে, প্রেমিক আপনার হৃদয়-পুত্তলকে ভালবাসে, আর পাগল আপনার ভাবকে আপনি ভাল-বাসে। তিনই ভালবাসার দাস। ইহাকে এইরূপ বলিলেও হয়, যে ভালবাসে, সেই কবি, আর যে কবি, সেই ভালবাসে; যে ভালবাসে, সেই পাগল, আর যে পাগল, সেই ভালবাসে। ভালবাসায় নিত্যযৌবন, নিত্যবসন্ত, নিত্যনূতনত্ব! কবি না হইলে, আর পাগল হইতে না পারিলে, সেই মন্দাকিনীধৌত অমৃতনিকেতনে—প্রেমময়ী প্রকৃতির সেই নিভৃত কুঞ্জকাননে কে প্রবেশ করিতে পারে?

সাধনায় সিদ্ধি আছে, এবং তপশ্চর্য্যায়ও মুক্তি আছে। ভালবাসা অতি দুঃসাধ্য সাধনা, অতি দুষ্কর তপশ্চর্য্যা; কিন্তু ইহাতে সিদ্ধি, মুক্তি, কিছুই নাই। স্রোতের জল সাগরে গিয়া বিরাম লাভ করে। যে ভালবাসে, তাহার হৃদয়ের স্রোত চির-কাল চলিতে থাকে, চিরকাল চলিতে থাকিবে, কোথাও গিয়া উহার বিরাম নাই। কেন যে, সে ভালবাসে, স্বার্থের এই সূক্ষ্ম প্রশ্ন কখনও তাহার মনে উদিত হয় না; হইলেও তাহার দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর হয় না। যদি প্রশ্ন এবং উত্তর করিতেই সে সমর্থ হইবে, তবে আর তাহার ভালবাসা কিসে? এবং সে ভালবাসিবেই বা কেন?

তবে কি ভালবাসায় কোন পুণ্য নাই?—আছে। সে পুণ্য অতি মহামূল্য পদার্থ, দেবদুর্ল্লভ রত্ন। যাহার ভাগ্যে তাহা

ঘটে, সে তাহা ভোগ করে, অথচ জানিতে পায় না। জানিলে আর উহা তাহার ভোগে আসে না। ভালবাসার এক অসামান্য গৌরব এই যে, উহা মনুষ্যকে মহত্ত্ব প্রদান করে। পূর্ব্বেই ইহা বলিয়াছি যে, এ যজ্ঞের আহুতি স্বার্থ, ইহার দক্ষিণা মান। যে ভালবাসে, তাহাকে অবশ্যই স্বার্থ ত্যাগ করিতে হয়, নহিলে সে ভালবাসিতে পারে না; এবং যে ক্রমে ক্রমে স্বার্থ ত্যাগ করিতে শিক্ষা করে, সে অবশ্যই মহত্ত্ব লাভ করিয়া পূর্ণকাম হয়। মনুষ্যহৃদয়ের বিকাশের পথে যত প্রকার অন্তরায় আছে, স্বার্থ চিন্তাই তাহার প্রধান। স্বার্থচিন্তা শীতের মত; উহা মনুষ্যকে একটুকু একটুকু করিয়া সংকুচিত করে, একটুকু একটুকু করিয়া কমাইয়া আনে, এবং কমাইতে কমাইতে, সংকুচিত করিতে করিতে, তাহাকে অবসানে একবারে প্রাণহীন, মনুষ্যত্বহীন জড়পিণ্ড করিয়া ফেলে। ভালবাসার স্বর্গীয় বহ্নি তাহাকে কোন মতেই কমিতে দেয় না। উহা তাহার হৃদয়কে একটু একটু করিয়া বাড়াইতে থাকে, একটু একটু করিয়া প্রসারিত করে, এবং এইরূপ বাড়াইয়া ও এইরূপ প্রসারিত করিয়া, পরিণামে তাহার ঐ একই হৃদয়কে শত সহস্র হৃদয়ের আশ্রয়ক্ষেত্র এবং তৃপ্তিস্থল করিয়া তুলে। যে এক জনকেও যথার্থ ভালবাসিতে পারে, সে সমস্ত জগৎকেই ভালবাসে। সমুদ্রের জল যখন পূর্ণপরিবাহে উথলিয়া উঠে, তখন নদ, নদী, হ্রদ ও সরোবর সর্ব্বত্রই তাহা প্রবাহিত হইয়া পড়ে। মনুষ্যের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠতর সম্পদ কি? ভাল না বাসিলে, তুমি তোমার আপনার ক্ষুদ্রতাতে আপনি কোনমতে লুক্কায়িত হইয়া, যেন নাই এই ভাবে, অবস্থান করিবে;—কূর্ম্মশাবক যেমন শুণ্ড সংকোচন করিয়া আপনাতে আপনি প্রবিষ্ট হইয়া রহে, মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, তুমিও সেইরূপ রহিবে। আর,

যদি হৃদয়কে খুলিয়া দিয়া ভালবাসিতে পার, তবে সংসারে কত হৃদয়কেই না তুমি 'তোমার' করিয়া কিনিয়া রাখিবে, কত হৃদয়ের উপরই না তোমার হৃদয় ছড়াইয়া দিবে। ভালবাসার নাম 'মমতা'। তুমি যাহাকে ভালবাসিলে, সেই তোমার হইল ;—যাহাকে যে ক্ষণ হইতে যে পরিমাণে ভালবাসিলে, সেই সেই ক্ষণ হইতে সেই পরিমাণে তোমার হইয়া রহিল। সে জানুক আর না জানুক, সে ইচ্ছা করুক আর না করুক, তাহাতে তোমার অধিকার পঁহুছিল। সে তোমায় ভালবাসুক আর নাই বাসুক, তোমার মমতা, চন্দ্রমার লক্ষযোজন দুরস্থ স্নিগ্ধ-কৌমুদীর ন্যায়, দূরে থাকিয়াও তাহাতে গিয়া ছাইয়া পড়িল। যদি তাহাকে ইহজন্মেও দেখিতে না পাও, তথাপি তোমার হৃদয়, দেশ ও কালের আবরণ ভেদ করিয়া, তাহার হৃদয়ে গিয়া স্পৃষ্ট হইবে ; এবং সে যেখানে যে অবস্থায় অবস্থিত থাকুক, তোমাকে তাহাতে লইয়া যাইবে।

ভালবাসার আর এক গৌরব এই, উহা মনুষ্যকে পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণবিকশিত করে। যে ভালবাসে না, তাহাতে পুরুষ আছে, প্রকৃতি নাই ; সে অর্দ্ধাঙ্গ, অর্দ্ধবিকশিত। যে ভালবাসে, তাহাতে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই বিরাজ করে ; সে পূর্ণাঙ্গ, পূর্ণবিকশিত। হে অভিমানগুম্ফিত পাষাণচিত্ত পুরুষসিংহ! হে বাহুবলদৃপ্ত দৃক্‌পাতশূন্য বীরবর! হে জ্ঞানমাত্রপরায়ণ গ্রন্থার্ণবমগ্ন ধীর! তুমি নানাবিধ পৌরুষ গুণে যেমন উচ্চশ্রেণীর মহাপুরুষই কেন হও না, আপনার অধ্যাত্মবলের উপর যত কেন নির্ভর কর না, যদি তুমি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন 'মনুষ্য' হইতে অভিলাষী হও, যদি তুমি 'সুন্দর' হইতে ইচ্ছা কর, তবে ভাল-বাস ;—আপনাকে পরের করিয়া, পরমুখপ্রেক্ষিণী অবলার মত ভালবাস। যে ভালবাসায় অবলা নহে, সে ধ্যান, ধারণা,

আরাধনার কিছুই জানে না। তাহার জীবন উপাসনাশূন্য; সে নাস্তিক। পৌত্তলিকতা আর কি? ভালবাসাই পৌত্তলিকতা। যে ভালবাসে, ঘোর পৌত্তলিকও তাহা অপেক্ষা অধিকতর পৌত্তলিক নয়। কিন্তু যে হৃদয়ে এই পৌত্তলিকতা নাই, সেখানে সর্ব্বদাই অমাবস্যার আতঙ্কজনক গভীর অন্ধকার।

লোকারণ্য।



মনের আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে কাহারও সহিত কাহারও একতা নাই। কেহ সাগরের তরঙ্গবিলোল সুনীল বক্ষে ফেনান্বিত অট্টহাস দর্শনে পুলকিত হয়; কাহারও হৃদয়, ফুল, ফল, লতা, পাতা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর সুকুমার সৌন্দর্য্যের জন্যই সতত লালায়িত থাকে। আমি এই উভয়বিধ শোভাই সমান আদরের সহিত নয়ন ভরিয়া পান করিয়া থাকি; কিন্তু একত্র বহুসহস্রলোকের সমাবেশ দেখিলে, আমার যাদৃশ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বোধ হয়, জড়প্রকৃতির কোন পদার্থই আমায় সে আনন্দ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। আমি বিলাসীর প্রমোদকাননে পরিভ্রমণ করিয়াছি; নদ, নদী, সরোবর, বন, উপবন ও পর্ব্বতের নৈসর্গিক কান্তি অনিমেষলোচনে অবলোকন করিয়াছি; পূর্ণিমার প্রফুল্ল চন্দ্র, তরুর পত্রে পত্রে, মেঘের পটলে পটলে কিরূপ মনোহর ক্রীড়া করে, তাহাও দর্শন করিয়াছি; ইহার কিছুই আমার নিকট লোকারণ্যের সেই বিস্ময়জনক ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্যের সমান বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই।

জড়প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে প্রাণ নাই, উহা নিস্তেজ ও নির্জ্জীব; লোকারণ্যের সৌন্দর্য্য প্রাণবিশিষ্ট, উহা সতেজ ও সজীব। সংসারে লোকারণ্যের ন্যায় অদ্ভুতদৃশ্য কি আছে, জানি না। যাহার চিত্ত লোকারণ্য দেখিলেও নাচিয়া না উঠে, সে মনুষ্যসমাজের কেহই নহে, এবং মানবজাতির সুখ, দুঃখ,

হর্ষ ও বিষাদের সহিত তাহার কখনও সহানুভূতি থাকিতে পারে না।

ত্রিতন্ত্রী, এস্রার্, বীণা, বেণু, মন্দিরা ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ যন্ত্রের ধ্বনি একীভূত হইয়া নিঃসৃত হইলে, শ্রোতৃবর্গ যেরূপ অনুপম সুখানুভব করেন ; ভাবুকের মন, লোকারণ্যের সমবেত কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তাহা অপেক্ষাও গভীরতর সুখ অনুভব করে। কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ দূর হইতে বন্ধুজনকে তারস্বরে আহ্বান করে, কাহারও কণ্ঠ হইতে ক্রোধের শ্রুতি-কর্কশ কম্পিত স্বর বহির্গত হয়, কেহ বা পার্শ্বস্থিত প্রণয়িজনের চিরপিপাসু কর্ণে মৃদু মৃদু মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে ;—ঐ সমুদয় ধ্বনি একস্রোতের ন্যায় মিশ্রিত হইয়া, মানবজীবনের জয়ধ্বনিরূপে গগনাভিমুখে উত্থিত হয় এবং ভাবুক ব্যক্তি, শ্রবণ করিতে করিতে, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সমস্ত ভুলিয়া গিয়া, ঐ স্রোতেই আপনার হৃদয় ঢালিয়া দেয়। সে আছে কি নাই, তাহাও তখন তাহার মনে থাকে না।

তরুলতার অরণ্য নয়নেরই বিনোদন করে, প্রকৃতপ্রস্তাবে হৃদয়ের উদ্দীপন করিতে সমর্থ হয় না। লোকারণ্য নয়নের প্রীতিকর, এবং হৃদয়েরও উদ্দীপক। যে অসংখ্য লোক একত্র মিলিত হইয়া, ঐরূপ অপূর্ব্বমূর্ত্তি ধারণ করে, তাহাদিগের প্রত্যেকেই এক এক খানি কাব্য, অথবা এক এক খানি ইতিহাস। প্রতিজনের মানসপটে কতই বা সুখের কথা এবং কতই বা দুঃখের কথা লিখিত রহিয়াছে, প্রতিজনের মস্তকের উপর দিয়া বিঘ্নবিপদের ঝঞ্ঝাবায়ু কতভাবে ও কতবার প্রবাহিত হইয়াছে, সংসারের প্রতিকূলস্রোতে প্রতিজনই কত বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে, মন লৌকিক জগতের কত উর্দ্ধে উত্থান করে, তাহা কখনই বাক্যে নির্ব্বচন করা যায়

না। এই নিমিত্তই লোকারণ্যরূপ বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করিয়া, কবি ও দার্শনিক উভয়েই সমান মুগ্ধ হন এবং কল্পনা ও চিন্তা উভয়ই তখন যুগপৎ জাগরিত হইয়া সমানভাবে ক্রীড়া করে।

মনুষ্যের আলস্য, ঔদাস্য এবং অকর্ম্মণ্য জীবন অবলোকন করিলে, মানবজাতি যে জীবিত আছে, এ বিষয়েই সংশয় হয়, এবং সংশয়ের সঙ্গে এক ভয়ানক নৈরাশ্যের ভাব আসিয়া, মনকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। কিন্তু যখন দৈবাৎ কোন স্থলে হলহলাময় লোকধ্বনি শ্রবণ করি, এবং লোকারণ্যের ভৈরব-চ্ছবি প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করি, তখন সেই সংশয় এবং সেই নৈরাশ্য আপনা হইতেই অপনীত হইয়া যায়। বহু সহস্র লোক কেন প্রমত্তভাবে একত্র হয়, কেন বহুলোকের হৃদয়যন্ত্র একভাবে একসঙ্গে বাজিয়া উঠে, ইত্যাদি চিন্তাসূত্র অবলম্বন করিয়া, লোকসংগ্রহের মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও, একবারে মানবপ্রকৃতির মূল প্রস্রবণের সন্নিধানে উপস্থিত হইবে, এবং যাহা কখনও জানিতে পাও নাই, তাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া, আশায় ও আনন্দে অশ্রুধারা বর্ষণ করিবে।

বুদ্ধি মনুষ্যের প্রকৃত জীবন নহে, জীবনের পথপ্রদর্শিকা অথবা আলোকবর্ত্তিকা। মনুষ্যের প্রকৃত জীবন হৃদয়। হৃদয়ের প্রবাহ রুদ্ধ হইলে, অনুরাগ, বিরাগ, সুখ, দুঃখ, নিদ্রা, জাগরণ সকলই স্বপ্নবৎ অলীক হইয়া উঠে। মনুষ্যজাতির সেই হৃদয় আছে, না শুকাইয়া গিয়াছে, তাহার প্রধান পরীক্ষাস্থান লোকারণ্য। লোকারণ্যে কোথাও ভক্তির স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও দেশানুরাগ, যুগান্তের মোহ হইতে সহসা উত্থিত হইয়া, ঝটিকাবায়ুর ভীমস্বরে গর্জ্জন করিতেছে, কোথাও বহুদিনের অপমান, ক্লেশ ও দুঃখযন্ত্রণা, অকস্মাৎ বেলাভূমি

অতিক্রম করিয়া, প্রলয়পয়োধির উচ্ছ্বাসের ন্যায় সংসার ডুবাইয়া দিতেছে, এবং পুরাতন ও নূতন, ভাল ও মন্দ, যাহা কিছু সম্মুখে পড়িতেছে, সমুদয় ভাসাইয়া লইতেছে।

পৃথিবীর কতকগুলি জাতি মৃত, আর কতকগুলি জীবিত। মৃতজাতীয় মনুষ্য সকল বিষয়েই নির্লিপ্ত, তাহারা ভোগরত হইয়াও যোগী, কারণ কিছুতেই আসক্ত নহে; গৃহী হইয়াও বানপ্রস্থ এবং বিলাসী হইয়াও উদাসীন। তাহাদিগের প্রধান লক্ষণ এই, তাহারা আপন বই বুঝে না, স্ত্রীপুত্র বই আর চেনে না, এবং বর্ত্তমান ক্ষণের বর্ত্তমান সুখ বিনা আর কিছুই চিত্তে ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদিগের হৃদয় তড়াগের বদ্ধজলের ন্যায়; উহাতে চাঞ্চল্য, প্রবাহ ও তরঙ্গ কিছুই নাই; এবং আপনার ও বর্ত্তমান ক্ষণের সহিত যে বস্তুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তাহা তাহাদিগের নিকট সর্ব্বদা অবস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। তাদৃশ লোকেরা লোকারণ্যের মহিমা কোন প্রকারেই বুঝিতে পায় না, এবং লোকসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া সাধারণের অদৃষ্টের সহিত আপনাদিগের অদৃষ্ট মিশ্রিত করিতে, সাধারণের একাঙ্গ হইয়া সংসারের গতি পরিবর্ত্তের কারণ হইতে, কখনই ইচ্ছুক হয় না। যাহা আছে, তাহা ক্রোড়ে লইয়া, খট্টার তলে কোন এক কোণে মাথা লুকাইয়া, প্রাণে প্রাণে কুশলে থাকিতে পারিলেই, তাহাদিগের সকল তৃষ্ণা চরিতার্থ হয়। যে সকল জাতি জীবিত রহিয়াছে, যাহাদিগের হৃদয়ের স্রোত অদ্যাপি তর তর ধারে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদিগের লক্ষণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা প্রমত্ত, সুতরাং অতিসহজেই উত্তেজিত হয়। তাহারা জীবন্ত বারুদ-গৃহ, অগ্নির স্ফুলিঙ্গমাত্র পতিত হইলেই, ধগ্ ধগ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। তাহারা হাসিতে জানে, কাঁদিতে জানে, লোককে প্রশংসা করিতে জানে, লোককে নিন্দা করিতে জানে,

এবং কোন্ সূত্রে গ্রন্থন করিলে সকলের হৃদয় একটি স্তবকের ন্যায় গ্রথিত হইতে পারে, তাহাও বিলক্ষণরূপে জানে। মৃত-জাতীয়দিগের মধ্যে কখনও লোকারণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না; জীবিতজাতীয় মনুষ্যদিগের বাসস্থলই লোকারণ্যের যথার্থ স্থান।

ফরাশিদেশ লোকারণ্যের এক প্রধান প্রদর্শনক্ষেত্র। সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রণ্ড নামক সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবের কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত, ফ্রান্সে নিত্যই নূতন লোকারণ্য লোকের নয়নগোচর হইতেছে। ইহার অর্থ এই, ফরাশিরা বিপদের পর বিপদে আক্রান্ত হইয়াছে, কখনও ভূতলে পড়িয়াছে, কখনও উপরে উঠিয়াছে, কখনও বা যাই যাই হইয়াছে, কিন্তু একবারে মরিয়া যায় নাই। তাহাদিগের লোকারণ্য অভিমানিনী এনের নিদ্রা-ভঙ্গ করিয়াছে, ষোড়শ লুইকে শান্তির শয্যা হইতে চমকিত করিয়া উঠাইয়াছে, এবং বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে বার্ক প্রভৃতি প্রশান্তচিত্ত, সুস্থির, সুগভীর, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকেও পাগল বানাইয়া তুলিয়াছে। ইহা কেন? না ফ্রান্স জীবিত রাজ্য।

ইংলণ্ডে, প্রজাপ্রতিনিধিনির্ব্বাচন অথবা কোন রাজকীয় বিধির পরিবর্ত্তনের সময়ে কিরূপ লোকভয়ঙ্কর তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়, তাহা সকলেরই অবগতির বিষয়। তখন পণ্ডিত মূর্খ, ধনী নির্ধন, সকলেই দেশের এক প্রান্ত অবধি আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ক্ষেপিয়া উঠে। বোধ হয়, যেন সমস্ত দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। এক এক স্থলে পঞ্চাশৎ সহস্রেরও অধিক লোক মিলিত হইয়া চীৎকার করে, আর সেই চীৎকারে সমুদয় ইয়ুরোপ কাঁপিতে থাকে। ইংলণ্ড কি সভ্য নয়? ইংলণ্ডে কি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান্ লোক বর্ত্তমান নাই? কিন্তু ইংলণ্ডের বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা, সামাজিকতা, কিছুই উহার হৃদয়াবেগ এবং লোকারণ্য

অবরোধ করিতে পারে না। কারণ, ইংলণ্ড জীবিত রহিয়াছে।

ভারতবর্ষ যখন জীবিত ছিল, তখন ভারতবাসীরা লোকারণ্য দর্শন করিয়া আহ্লাদে ঢল ঢল হইত। ইদানীং তাহা হয় না, কারণ, ইদানীং ভারতবর্ষ জীবিত নাই। পৃথ্বীরাজের পর হইতেই ভারতবর্ষ প্রাণহীন হইয়া, এক ভয়ানক শ্মশানের বেশ ধারণ করিয়াছে; চাহিয়াও দেখিতে ইচ্ছা হয় না। ভারতবর্ষে ভক্তির স্রোত অদ্যাপি প্রবহমাণ রহিয়াছে; এই হেতু, অদ্যাপি তীর্থস্থলে লোকারণ্যের মাহাত্ম্য কিয়দংশে অনুভূত হয়। কিন্তু অন্য কোন এক ভাবে, কি কোন এক কথাতেই এ দেশীয়েরা এইক্ষণ আর একহৃদয়বৎ নাচিয়া উঠে না, অথবা একত্র দণ্ডায়মান হয় না।

রাজা ও প্রজা।

রাজা ও রাজপদ কোন্ সময়ে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা অবধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। রাজত্বের উৎপত্তি বিষয়ে পণ্ডিতদিগের ঐকমত্য নাই। পণ্ডিতেরা সমাজসংস্থাপনবিষয়েও যেরূপ নানাবিধ বিচিত্র কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, রাজশাসনের প্রথম প্রতিষ্ঠাবিষয়েও সেইরূপ বহুপ্রকার কপোলকল্পিত মতকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কেহ বলেন, অতি পূর্ব্বকালে মনুষ্যসমাজে কোন ব্যক্তিই রাজপূজা প্রাপ্ত হইত না। যেমন এখন এক এক পরিবারে এক এক জন কর্ত্তা থাকে, পূর্ব্বকালেও এক এক পরিবারে ঐরূপ এক এক জন কর্ত্তা থাকিত। ঐ পারিবারিক প্রভুতাই নানাকারণবশতঃ কালে বহুপরিবারের উপর প্রসারিত হইয়া, রাজশক্তির মূর্ত্তি ধারণ করে। কাহারও মত এই যে, সামাজিকেরা, পরাক্রান্ত প্রতিবেশীর অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত, শারীরিক বল, অস্ত্রনৈপুণ্য এবং সাহসাদি গুণের পরীক্ষা লইয়া, আপনাদিগের মধ্যে এক জনকে রাজপদে অভিষেক করিত, এবং অভিষেকের পরক্ষণ হইতে তিনিই সকল বিষয়ে সকলের অগ্রণী হইতেন। কোন মহাত্মা সিদ্ধান্ত করেন, ইদানীং সংসারে অধর্ম্মের যেরূপ ভয়ানক প্রভাব হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। পূর্ব্বকালের লোকেরা অসদ্ব্যবহার জানিত না, অসাধুপথে পাদচারণা করিত না, এবং পরকালের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, ইহকালের সেবা

করিত না। তাহারা যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ধার্ম্মিক এবং পরমার্থ-পরায়ণ বিবেচনা করিত, তাহাকে গুরু বলিয়া পূজা করিত। ক্রমে পারত্রিক মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে ঐহিক মঙ্গলের রক্ষণাবেক্ষণ-ভারও ঐ গুরুদিগের হস্তে ন্যস্ত হইল; এবং এই হেতু গুরুরাই পরিশেষে রাজা হইলেন। অরণ্যচারী আরব, তাতার, এবং দ্বীপ ও পর্ব্বতবাসী অসভ্যজাতিসমূহের বর্ত্তমান রীতিপদ্ধতির পর্য্যালোচনা করিলে, এই সকল বিভিন্ন মতের অনুকূল নানারূপ নিদর্শন সঙ্কলিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা এইক্ষণ আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। কিরূপে রাজপদের সৃষ্টি হয়, তাহার অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া, রাজা ও প্রজা পরস্পর কি সম্বন্ধে বদ্ধ, এই দুইয়ের মধ্যে কে প্রভু, কে সেবক, তাহাই আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

যে সকল রাজ্য, উদিত ও বিকশিত হইয়া, কালশাসনে পুনরায় লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, মনুষ্যজীবনের যেমন বাল্য, যৌবন, এবং বার্দ্ধক্য এই তিনটি পৃথক্ পরিচ্ছেদ আছে, রাজনীতিরও বয়ঃ-কালভেদে সেইরূপ তিনটি পৃথক্ যুগ নিরূপিত রহিয়াছে। সংজ্ঞা দিতে হইলে, প্রথম কালকে রাজযুগ, মধ্যম কালকে মিশ্রযুগ, এবং রাজনীতির পরিপক্ক প্রৌঢ় কালকে প্রাকৃতযুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

মনুষ্য অতিপ্রথমে নিরাকারা নীতির মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারে না। তখন সে সকল বিষয়েই সাধ করিয়া দণ্ড-ধারী পুরুষের অধীন হইতে ইচ্ছুক হয়। আমরা রাজ্যসংস্থানের ঐ কালকে রাজযুগ বলিয়া ব্যাখ্যা করি। রাজযুগে রাজারাই সর্ব্বে সর্ব্বা,—প্রজা কিছুই নহে। ব্যবস্থাপকেরা সে সময়ে রাজার সুখ, রাজার সম্মান, এবং রাজকীয়শক্তির সীমাবৃদ্ধির

জন্য কায়মনোবাক্যে যত্নপর হয়েন, প্রজাকে কোন বিষয়েই গণনাস্থলে উপস্থিত করেন না। অধিক কি, প্রজা যে মনুষ্য এবং তাহার যে মনুষ্যোচিত কতকগুলি স্বত্ব ও কতকগুলি স্বাভাবিক স্পৃহা আছে, তাহাও তাঁহারা ভুলিয়া মনে করেন না। রাজনীতি বিষয়ে মনুসংহিতার ব্যবস্থাকেই অতিপ্রাচীন অনুশাসন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,— * "জগৎ অরাজক হইলে, সকলেই বলবানের ভয়ে বিচলিত হইবে, এই হেতু বিধাতা সমুদয় চরাচরের রক্ষার জন্য ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কুবের এই অষ্টদিক্‌পালের সারভূত অংশ গ্রহণ করিয়া, রাজার সৃষ্টি করেন। যেহেতু

---

* "অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥
ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥
যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা॥
তপত্যাদিত্যবচ্চৈষ চক্ষূংষি চ মনাংসি চ।
নচৈনং ভুবি শক্নোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুং॥
সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ॥
বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥
একমেব দহত্যগ্নির্নরং দুরুপসর্পিণং।
কুলং দহতি রাজাগ্নিঃ সপশুদ্রব্যসঞ্চয়ং॥
যস্য প্রসাদে পদ্মাশ্রীর্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়ো হি সঃ॥
তং যস্তু দ্বেষ্টি সংমোহাৎ স বিনশ্যত্যসংশয়ং।
তস্যহ্যাশুবিনাশায় রাজা প্রকুরুতে মনঃ॥"

রাজা ইন্দ্রাদি প্রধান দেবতাদিগের অংশে নির্ম্মিত হইয়াছেন, অতএব তিনি স্বকীয় তেজে সকল প্রাণীকেই অভিভব করিতে পারেন। রাজা, সূর্য্যের ন্যায় দর্শকবৃন্দের চক্ষু ও মনকে সন্তাপিত করেন; পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিই রাজাকে আভিমুখ্যে অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না। শক্তির আতিশয্য হেতু, তিনি অগ্নি, তিনি বায়ু, তিনি সূর্য্য, তিনি চন্দ্র, তিনি যম, তিনি কুবের, তিনি বরুণ এবং তিনিই মহেন্দ্র। রাজা বালক হইলেও, তাঁহাকে মনুষ্যজ্ঞানে অবজ্ঞা করিবেক না, যেহেতু তিনি প্রধান দেবতা নররূপে অবস্থান করিতেছেন। যে ব্যক্তি অসাবধান হইয়া, অগ্নির অতিনিকটে গমন করে, অগ্নি কেবল তাহাকেই দগ্ধ করেন; কিন্তু রাজরূপী অগ্নি পুত্রদারভ্রাত্রাদিরূপ কুল, গো, অশ্ব, মেষাদি পশু, এবং সুবর্ণাদি ধনসঞ্চয় সমুদয়ই দহন করেন। রাজা সর্ব্বতেজোময়। তিনি প্রসন্ন হইলে মহতী শ্রীলাভ হয়, তাঁহার পরাক্রমে দুর্দ্দম শত্রুকেও দমন করা যায়, এবং তিনি কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে, তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটে। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ রাজার অপ্রীতিকর কার্য্য করে, সে নিঃসংশয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যেহেতু রাজা স্বয়ং তাহার বিনাশের জন্য মনোযোগ করেন।”

এই বচনগুলি পাঠ করিবার সময়, কেহই রাজা ও প্রজাকে একজাতীয় মনুষ্য বলিয়া, সিদ্ধান্ত করিতে পারে না। মনে আপনা হইতেই এইরূপ ধারণা হয় যে, সমস্ত মনুষ্য জাতি ইতর প্রাণী, আর রাজমুকুটমণ্ডিত মহাপুরুষেরা কোন এক বিশেষ প্রকারে অলৌকিক জীব। তাঁহাদিগের শক্তির ইয়ত্তা নাই, ইচ্ছার নিয়ামক নাই, এবং অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপেরও বিচার-স্থান নাই। তাঁহাদিগের নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তি, যে দিগে বল, সেই দিকেই প্রধাবিত হইতে পারে। উহার গতিপথে কেহই কোন-

রূপ বাধা দিতে অধিকারী কিংবা সমর্থ নহে। মনুসংহিতায় যদিও ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত, দুর্ম্মন্ত্রিপরিবৃত, দুর্ব্বিনীত রাজার অখ্যাতি ও বিনাশসম্ভাবনার কথা লিখিত আছে; সে লেখা, স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থার মত, লেখা মাত্র। কারণ রাজা রাজধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া, প্রজার স্বত্ব ও অধিকারের উপর আক্রমণ করিলে, সমবেত প্রজাবর্গ তাঁহাকে অপরাধীর ন্যায় বিচারস্থলে আনয়ন করিয়া, যথারীতি দণ্ডবিধান করিতে পারিবে, এমন কোন স্পষ্ট বিধি মনু কিংবা মনুর উত্তরকালবর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের গ্রন্থমধ্যে পরিলক্ষিত হয় না।

ইয়ুরোপেও পুরাকালে রাজারা দেবাংশসম্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইতেন, এবং রাজশক্তি সর্ব্বথা অপ্রতিহত ও উচ্ছৃঙ্খল ছিল। মনু যেমন বলিয়াছেন, "মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি," ইয়ুরোপের কবিও সেইরূপ দেশীয়দিগের হৃদয়ের অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন, "দৈবী শক্তি আপনিই আবরণ হইয়া, রাজার রক্ষা করেন।" ইংলণ্ডীয় রাজনীতিশাস্ত্রের শিরঃস্থানে অদ্যাপি জ্বলদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, "রাজা কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে পারেন না।" এ কথার মর্ম্মার্থ এই, রাজা, প্রভাব ও প্রকৃতি উভয় বিষয়েই, লৌকিক জগতের এত উর্দ্ধে অবস্থান করেন যে, তদীয় চরিত্রে কখনও কোনরূপ দোষস্পর্শ সম্ভবে না।

পূর্ব্বে রোম, পরে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুসিয়া প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিরা কোন দিনও আপনাদিগকে কৃতকর্ম্মের জন্য মনুষ্যের নিকট দায়ী বিবেচনা করিতেন না। তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছেন, দেশের কোন শক্তি তাঁহাদিগের সর্ব্বগ্রাসিনী প্রভুশক্তির সম্মুখীন হইতে পারে নাই। লোকের মান, মর্য্যাদা, বিষয়, বৈভব, সমস্তই সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগের তরঙ্গায়িত চঞ্চল-

মতির উপর নির্ভর করিত। তাঁহাদিগের কৃপাকটাক্ষ নিপতিত হইলে, অতিকুক্রিয়ান্বিত অধম ব্যক্তিও একরাত্রির মধ্যে দেশে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য হইয়া উঠিত, এবং তাঁহাদিগের অকৃপা হইলে বহুদিনের সম্ভ্রান্ত, বহুলোকপূজিত ব্যক্তিও দেখিতে দেখিতেই ধনে প্রাণে অপার দুঃখার্ণবে ডুবিয়া যাইত।

রাজশক্তির আধিপত্য-সময়ে সকল রাজাই প্রজার স্বত্বকে পদতলে দলন করিয়াছেন, এইরূপ বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে, এবং ইহা বস্তুতঃ ইতিহাসবিরুদ্ধ। মনুষ্য সিংহাসনেই শোভা পাউক, অথবা জীর্ণবস্ত্রে আবৃত হইয়া, পর্ণকুটীরেই অবস্থান করুক, তাহাকে অবশ্যই মনুষ্য বলিব। এবং মনুষ্য হইলেই, সে মানবজাতির স্তুতিনিন্দারূপ সুদৃঢ় শাসনের অধীন হইল। যদি পৃথিবীস্থ সমস্ত স্বেচ্ছাচার রাজা, নিরো ও কেলিগুলা প্রভৃতি অমানুষ নরপতিদিগের মত, লোকপীড়নকেই নিজ নিজ জীবনের একমাত্র ব্রত জ্ঞান করিত, যদি তাহারা সকলেই ন্যায়কে অন্যায়, এবং অন্যায়কে ন্যায়রূপে প্রতিপাদন করিতে যত্নপর হইত,—যদি প্রজার সুখ দুঃখকে রাজার প্রবৃত্তিসাগরে ডুবাইয়া দেওয়াই রাজনীতির প্রধান সূত্র হইয়া উঠিত, তাহা হইলে মানবসমাজের একীভূত হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এক ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়া, সমুদয় জগৎকে চমকিত করিত, সন্দেহ নাই। যে সকল রাজা কোন রূপ নিয়মের অধীন নহেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও যে, অনেকে বিনীত, প্রজারঞ্জনরত ও সদাচারপরায়ণ হইয়া, জগতের হিতানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, প্রাগুক্ত লৌকিকশাসনই তাহার কারণ। ইংলণ্ডীয় এলফ্রেড পার্লিয়ামেণ্টের অধীন ছিলেন না, অথচ পার্লিয়ামেণ্টের নিয়মাধীন কোন রাজাই ন্যায়পরতা কিংবা প্রজাবৎসলতা বিষয়ে এলফ্রেডের সমকক্ষ বলিয়া, গণ্য হইবার যোগ্য-

ব্যক্তি নহেন। সকল দেশের রাজবংশাবলীতেই এইরূপ দুই একটি সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত সাধুপুরুষের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু রাজা সদাচারনিষ্ঠ হইলেই যে, রাজশক্তি খর্ব্বীকৃত হইল এবং প্রজার ক্ষমতা বাড়িল, এমন নহে।

আমরা যে কালকে রাজনীতির মিশ্রযুগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অভ্যুদয় হইলেই, প্রজাবর্গের মনুষ্যসংখ্যায় গণনারম্ভ হয়। এস্থলে মনুষ্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে রাজ্যের শাসনপ্রণালী, আয় ব্যয়ের সংস্থাপন, রাজপুরুষনিয়োগ এবং পররাজ্যের সহিত শক্রতা কি মিত্রতা ইত্যাদি কোন বিষয়েই প্রজার মতামত থাকে না;—সিংহাসনারূঢ় এক ব্যক্তি যেরূপ ইচ্ছা করে, এক কোটি লোকের অনিচ্ছা হইলেও তাহাই কার্য্যে পরিণত হয়, এবং সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য যদি সকলকে সর্ব্বস্বে বঞ্চিত হইয়া, হৃদয়ের শোণিত অজস্রধারায় ঢালিতে হয়, তাহাতেও কিছু আসে যায় না। এই সময়ে সেই ভাব অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়া, আসে। রাজার শক্তি অল্প অল্প করিয়া কমিতে থাকে এবং প্রজার ক্ষমতা অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি পায়। রাজা এবং রাজকীয় শক্তি যখন একবারে প্রজার শক্তিতে বিলীন হইয়া যায়, তখনই যথার্থ প্রাকৃতযুগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতবর্ষীয় রাজারা যদিও শাস্ত্রানুসারে স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, কিন্তু বস্তুগত্যা তাঁহারা কখনও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা ব্যবহার করিতে অবসর পান নাই। ভারতবর্ষ চিরকালই ধর্ম্মনীতিপ্রিয় ও পুণ্যভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং হিন্দুরাজগণের আর কোন গুণ না থাকুক, দয়াপরতা এবং দেবলোকোচিত মাহাত্ম্য প্রদর্শন বিষয়ে কোন দেশের রাজার সহিত তাঁহাদিগের তুলনা হয় না। তাঁহারা সকলেই শ্রদ্ধা সহকারে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন

পালন করিতেন, এবং পাছে প্রজাপালক নামে কোন প্রকারে কলঙ্করেখা নিপতিত হয়, এই ভয়ে সকলেই সতত ভীত থাকিতেন। ভারতবর্ষীয় সম্রাটের নিকট প্রজার সন্তোষ অসন্তোষের আদর ছিল কি না, রাজা রামচন্দ্রের অলোকসাধারণ অদ্ভুত কীর্ত্তিই তাহার প্রমাণ। আর একটি কথা এই, এ দেশের ক্ষত্রকুলতিলকেরা প্রতাপে যতই বড় হইয়া থাকুন, তাঁহারা রাজনীতিঘটিত মন্ত্রণা এবং রাজশক্তির প্রয়োগকালে তপোরত ও দয়াশীল ঋষিসমাজের বাক্য লঙ্ঘন করিতে কখনই সাহসী হইতেন না, এবং ঋষিবাক্যই সকল সময়ে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি-স্রোতে ভয়ানক প্রতিবন্ধকের কার্য্য করিত। অতি দুর্দ্ধর্ষ সম্রাটগণও প্রজাবৎসল সামান্য ঋষিদিগকে দেবতার মত পূজা করিতেন, এবং তাঁহাদিগের আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইতেন। এই সমস্ত কারণবশতঃ ভারতবর্ষের প্রজা কোন সময়েই একবারে পশুবৎ নিষ্পেষিত হয় নাই। কিন্তু তাহাদিগকে যে, কোন সময়েও রাজশক্তির আদি প্রস্রবণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, এমন আমরা দেখিতে পাই না।

রাজা ও প্রজা, সেব্যসেবকসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া, স্বদেশের সেবায় মিলিতভাবে কার্য্য করিলে, কিরূপ আশ্চর্য্য ফল ফলিয়া থাকে, ইংলণ্ডই তাহার প্রধান উদারহরণস্থান। কিন্তু ইংলণ্ড অদ্যাপি মিশ্রযুগের ছায়ায় অবস্থান করিতেছে। ইংলণ্ডের প্রজা স্বাধীন, কিন্তু প্রভুনামবিবর্জ্জিত; ইংলণ্ডের প্রজা এখনও রাজা হয় নাই। যে সকল দেশে প্রজার রাজশক্তি অর্থাৎ প্রাকৃতযুগ সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আমেরিকাই ইদানীং সর্ব্বাংশে অগ্রগণ্য। আমেরিকায় ছোট বড় সকল ব্যক্তিই রাজা, যাঁহারা রাজপুরুষ বলিয়া পরিগণিত, তাঁহারা সেবকমাত্র।

রাজযুগ, মিশ্রযুগ এবং প্রাকৃতযুগ এই তিনের কোন্‌টি বিধিনির্দ্দিষ্ট, এবং পৃথিবীর মঙ্গলকর, তাহার বিচার করা এইক্ষণ আমাদিগের বিষয় নহে। কিন্তু আমরা ইহা অসঙ্কুচিত চিত্তে নির্দ্দেশ করিতে পারি যে, মানবজাতির চিন্তাস্রোতের গতি আজ কাল প্রাকৃতযুগের অনুকূল। মনুষ্যের সামাজিকশক্তি, যাহাতে একের হস্তে ন্যস্ত না থাকিয়া, যথাযথরূপে সকলের মধ্যে বিভক্ত হয়, এই অস্ফুট আকাঙ্ক্ষাই বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ লক্ষণ। পূর্ব্বে রাজারা প্রভু এবং সকল শক্তির আকর ছিলেন, এইক্ষণ প্রজাই সকল দেশে প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রভু এবং সকল শক্তির মূলাধার বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

বিনয়ে বাধা।

এ জগতে বিনীত বলিয়া লোকের নিকট প্রশংসিত হইতে কাহার না সাধ হয়? কত কঠোর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও, যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করা যায় না, যদি দুটি কথা বিক্রয় করিলেই, সেই কীর্ত্তি সঞ্চয় করা যায়, তবে কাহার প্রবৃত্তি না তাহাতে উন্মুখ হয়? তবে সকলেই বিনয়ে অবনত হয় না কেন? ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য, এবং ইহা হৃদয়রহস্য অথবা প্রকৃত দর্শনশাস্ত্রের কথা।

আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে এই বোধ জন্মিয়াছে যে, বিনয়ের পক্ষে অনেকেরই কতকগুলি বাস্তব কি অবাস্তব, কল্পিত কি অকল্পিত বাধা আছে। মনুষ্য সেই বাধাগুলিকে যতক্ষণ না অতিক্রম করিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার প্রকৃত বিনয়ী হওয়া অসম্ভব।

কাহারও মন স্বভাবতঃ বিনয়ের দিকে, কিন্তু তিনি বিনীত হন না,—লজ্জায়। লোকের নিকট বিনীত হইলে, পাছে লোকে তাঁহাকে ছোট মনে করে, খাট মনে করে, অথবা শক্তিহীন, সামর্থ্যহীন ও ক্ষমতাশূন্য কি সমাজের নিম্নশ্রেণিস্থ বিবেচনায় উপেক্ষা করে, এই লজ্জাতেই তিনি সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকেন, এবং যেখানে ঔদ্ধত্যে কিছুমাত্র সার্থকতা নাই, সেখানেও ঔদ্ধত্য দেখাইয়া, যেখানে দুরক্ষরের কোন্ প্রয়োজন নাই, সেখানেও দুরক্ষর বলিয়া, যেখানে ভ্রূকুঞ্চন, বিষদৃষ্টিবর্ষণ, ও সদর্প পদবিক্ষেপে, কোন আবশ্যকতা নাই, সেখানেও কুঞ্চিতভ্রূ,

কঠোরচক্ষু এবং দাম্ভিকভাবভঙ্গি ও কঠিনতা প্রদর্শন করিয়া বৃথা দুর্ব্বিনীত হন। এই শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরা প্রকৃত দীনাত্মা, প্রকৃত দরিদ্র। বিধাতা যাঁহাদিগের অঙ্গে জ্যোৎস্নারাশির ন্যায় রূপরাশি ঢালিয়া দিয়াছেন, রূপের কৃত্রিম ছটা দেখাইবার জন্য তাঁহাদিগের যত্ন থাকে না; এবং বিধাতা যাঁহাদিগকে শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা ও অন্য প্রকারের বৈভব দিয়াছেন, কৃত্রিম অভিমানের আবরণ দিয়া অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিতেও, তাঁহাদিগের মতি জন্মে না। যাঁহাদিগের আছে, তাঁহাদিগের আবার প্রদর্শন কি? প্রদর্শন দরিদ্রের জন্য। যাঁহাদিগের অন্তরে অভিমানের অমলজ্যোতিঃ, সাগরগর্ভনিহিত অমূল্যরত্নের ন্যায়, লোকচক্ষুর অগোচরে লুক্কায়িত রহে, বিনয়ে তাঁহাদিগের আবার লজ্জা কি? লজ্জা হীনজনের জন্য।

বিনয়ের আর এক বাধা ভয়। অনেকের বিনয়ী হইতে লজ্জা নাই। তাঁহারা জানেন যে, গরিমা আর বিনয়, কাঞ্চনময়ী প্রতিমায় কান্তি ও দৃঢ়তার ন্যায় অনায়াসে ও অতিসুখে একত্র অবস্থান করিতে পারে। তথাপি তাঁহারা বিনীত হন না,—ভয়ে। ভয় এই, পাছে বিনয়ের দিকে নাবিতে নাবিতে ক্রমে আত্মাবমাননা হয়, এবং আভ্যন্তরীণ সামর্থ্য দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই ভয়ের অর্থ, আপনাতে অবিশ্বাস। হা! বিড়ম্বনা! মানবপ্রকৃতির যে সমস্ত ক্ষমতাকে পৃথিবী 'শক্তি' বলিয়া পূজা করিয়াছে, লোকসন্নিকর্ষে ও সৌজন্য শিক্ষায় তাহার ক্ষয় হয়, না বৃদ্ধি হয়? বুদ্ধির স্বাভাবিকী প্রতিভা, মনস্বিতার অপরিহার্য্য গৌরব, আত্মার উচ্চতা, উদার হৃদয়ের মহিমা, এ সকল যদি বিনয়েই কমিবার বস্তু হয়, তবে আর ইহাদের দুর্ব্বহ ভারবহনের প্রয়োজন কি? তুমি যদি যথার্থ বড় লোক হও, নিশ্চয় জানিও যে, লোকের পাদপ্রান্তে

পড়িয়া থাকিলেও, তুমি মুকুটমণির ন্যায় শোভা পাইবে, এবং সকলকে আপনার ক্ষমতায় বাঁধিয়া রাখিবে। আর যদি তুমি যথার্থ ক্ষুদ্র লোক হও, তাহা হইলে ইহাও নিশ্চয় জানিও যে, তোমায় লোকের মস্তকে কি স্বর্ণসিংহাসনের শীর্ষস্থলে তুলিয়া দিলেও, তোমার স্বাভাবিকী ক্ষুদ্রতা সমস্ত আচ্ছাদন ভেদ করিয়া, বাহির হইয়া পড়িবে। অদীনসত্ব খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগের পদপ্রক্ষালন করিয়াছিলেন; তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তদীয় আজ্ঞা পালন করিতেন এবং তাঁহাদিগের পরবর্ত্তীরা অদ্যাপি তাঁহাকে জগতে অতুল, অনন্যসাধারণ দেবত্ব-সম্পন্ন বলিয়া আরাধনা করেন। নীরো রোমবাসীদিগকে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। লোকে অদ্যাপি তাঁহার নাম হইলেই, ঐ নামের উপরে, অন্ততঃ কল্পনায়ও, পাদুকাঘাত করে। বড় আর ছোট, লৌহ আর চৌম্বক; চৌম্বককে উর্দ্ধে রাখ, অধোতে রাখ, উত্তরে রাখ, দক্ষিণে রাখ, লৌহ অবধারিতরূপেই উহার আকর্ষণীর অধীন হইবে। কারণ, চৌম্বকে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। বড় আর ছোট, বহ্নি আর তৃণস্তূপ;—বহ্নিস্ফুলিঙ্গকে তৃণস্তূপের উপর রাখ আর নীচে রাখ, তৃণসংযোগে বহ্নি আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠিবে। কারণ, বহ্নিতেও চৌম্বকের মত অদৃষ্ট শক্তি আছে।

বিনয়ের তৃতীয় বাধা স্বার্থচিন্তা। মনে লজ্জাও নাই, ভয়ও নাই অথচ এই বিশ্বাস আছে যে, বিনয়ের অধীন হইলে স্বার্থরক্ষা হইবে না। যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর আঘাত না করিলে, কার্য্যোদ্ধার হয় না, তখন বিনয়ের মধুধারাসিঞ্চনে কি পুণ্য আছে, বল?

বিনয়ের পক্ষে এই প্রতিবন্ধককেও আমরা উপযুক্ত প্রতিবন্ধক বলিয়া স্বীকার করি না। লৌকিক কার্য্যক্ষেত্রে বজ্রের

ন্যায় আঘাত যে, সময়ে সময়ে অনিবার্য্য, তাহা আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বজ্র কি দুর্ব্বিনীত? বজ্রপাতের প্রথমে মেঘঘটা,—কি সুন্দর, কি সুখদর্শন, সুশীতল ছায়াপ্রদ। তার পর সৌদামিনীর মৃদু হাস্য। উহা কাহার মন না কাড়িয়া লয়? তার পর জলদমালার মিনতি, অবনতি ও অবিরাম বারিধারা; এবং তার পর উদ্ধতমস্তকে মুহুর্মুহুঃ অশনিপাত। তবে কেন বজ্রে বৃথা আর অবিনয়ের অপবাদ দাও? যদি বাহুতে বল থাকে, তবে পুরুষের মত দৃঢ়ভাবে কার্য্য কর, অথচ পুরুষের মত বিনীত হও। ইহাতে স্বার্থরক্ষার কখনও বিঘ্ন ঘটিবে না।

বীরসমাজে বোনাপার্টি নিতান্ত বিনীত ছিলেন। তাঁহার এই রীতি ছিল, তিনি, সমরাবসানে বিজয়-বৈজয়ন্তী দোলাইয়া দিয়া, তৎক্ষণাৎই শত্রুপক্ষের নিকট অতিকাতরকণ্ঠে সন্ধিসংস্থাপনের জন্য প্রার্থী হইতেন। ইংলণ্ডের চতুর্থ জর্জ এবং অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের নিকট, পুনঃপুনঃ জয়লাভের পরেও, তিনি স্বহস্তে যে সকল বিনয়পূর্ণ কাতরোক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, হীনতর কোন ব্যক্তি তদনুরূপ বিনীত হইতে সাহস পায় না।

পুরুষসিংহ প্রথম রিচার্ডও সামাজিকদিগের সহিত কথোপকথনে ও ব্যবহারে যার পর নাই বিনয়াবনত থাকিতেন। তিনি আপনার অমিত পরাক্রমকে এমনই এক দুর্ভেদ্য বর্ম্ম বলিয়া জানিতেন যে, স্বকীয় দৃঢ় দুই ভুজ এবং প্রশস্ত ললাট ভিন্ন রাজপরিচ্ছদের কিছুই আর আবশ্যক জ্ঞান করিতেন না। কিন্তু ইহাতেই তাঁহার সিংহের প্রতাপ সর্ব্বত্র অনুভূত হইত এবং সকলে আপনা হইতে আসিয়া, তাঁহার চরণোপান্তে গড়াইয়া পড়িত। অতি দুর্দ্ধর্ষ অভিমানীরাও তাঁহার বিনয়াবৃত অভিমানের নিকট পরাভব স্বীকার করিত। এদিকে তাঁহার কনিষ্ঠ,

শৃগাল জন, মানের কাল্পনিক অনুরোধে দুর্ব্বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াও, লোকের নিকট অপমানিত রহিতেন। অগ্রজের অনবদ্য পৌরুষদেহে যে মাধুরী রূপমুগ্ধা কামিনীর ন্যায় একবারে নিলীন থাকিত, তিনি মণিমুক্তার মালা পরিয়াও তাহার ছায়া পাইতেন না।

পুরাকালে রোমের এক তেজঃপুঞ্জ সম্রাট্ একদা পারিষদবর্গ সমভিব্যাহারে রাজপথে বায়ু সেবন করিতেছিলেন। একটি দীনমূর্ত্তি ভদ্রসন্তান দূর হইতে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া, তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। তিনি তাঁহা হইতেও অধিকতর অবনত হইয়া, তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিলেন। পারিষদদিগের মধ্যে এক জন এই আচরণের অর্থগ্রহ করিতে না পারিয়া, একটুকু হাসিতেছিলেন। সম্রাট্ সেই হাসির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনার কি এই অভিলাষ যে, সকল বিষয়ে ইহাঁ অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে অবস্থিত রহিয়া, এইক্ষণ বিনয়ে আমি ইহাঁর নিকট অধঃকৃত হইব?"

বিনয়ে যাঁহাদিগের লজ্জা হয়, ভয় হয় অথবা সাহসের অভাব হয়, বুদ্ধি থাকিলে তাঁহারা এই মহানুভাব সম্রাটের নিকট শিক্ষা লইবেন। আর, যাঁহাদিগের প্রকৃতিই বিনয়-বিরোধিনী,—বিষবর্ষিণী,—ছিন্নতার বীণার মত বিসংবাদিনী, তাঁহারা আত্মোৎকর্ষচিন্তায় এবং অধ্যাত্মসৌন্দর্য্যের গৌরবধ্যানে নিমগ্ন হইবেন।

হরগৌরী।

"আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে, আধ পটাম্বর সুন্দর সাজে ;
আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে, আধ ফণিফণা ধরি রে।
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা, আধ মণিময় হার উজালা,
আধ গলে শোভে গরল কালা, আধই সুধা মাধুরী রে ॥
এক হাতে শোভে ফণিভূষণ, এক হাতে শোভে মণিকঙ্কণ,
আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতূরা ভক্ষণ, আধই তাম্বুল পূরি রে।
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু এক লোচন, কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন,
আধ ভালে হরিতাল সুশোভন, আধই সিন্দূর পরি রে॥
কপাল-লোচন আধই আধে, মিলন হইল বড়ই সাধে,
দুই ভাগ অগ্নি এক অবাধে, হইল প্রণয় করি রে।
দোঁহার আধ আধ আধ শশী, শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি,
আধ জটাজূট গঙ্গা সরসী, আধই চারু কবরী রে ॥"

কবিবর ভারতচন্দ্র পুরাণ হইতে এই চিত্রটি তুলিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু যাঁহার কল্পনায় ইহা প্রথম প্রতিভাত হইয়াছিল, তাঁহার প্রশংসার সীমা নাই। তিনি অতি উচ্চশ্রেণির দার্শনিক, অতি প্রগাঢ় পণ্ডিত, অতি পূজনীয় কবি। তাঁহাকে আমরা অভিবাদন করি। তাঁহার এই লীলাময় চিত্রপটে সৌন্দর্য্যের কি বিচিত্র মাধুরী খেলা করিতেছে, মানব-প্রকৃতির পূর্ণাবয়তা কি আশ্চর্য্য শোভা পাইয়াছে, সামাজিক সম্পদের কি অপূর্ব্ব প্রতিমা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং দাম্পত্য-প্রেমের কি অলৌকিক প্রতিমূর্ত্তিই ইহাতে অঙ্কিত রহিয়াছে! এই চিত্র জগতে অতুল। ইহা মনস্বী ও ভাবুক, সকলেরই সমান ভোগ্য।

ইহার বহিঃস্থ পরিস্ফুট অর্থ পূর্ণসৌন্দর্য্য। এই অনন্ত নিসর্গরাজ্য সৌন্দর্য্যের এক অনন্ত সমুদ্র। ইহার তরঙ্গে তরঙ্গে কেবলই সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ। নয়নাভিরাম শ্যামল নভোমণ্ডলে, কুসুমকাননে, স্রোতস্বিনীর আবিল বক্ষে, চন্দ্রমার অমৃতময় জ্যোৎস্নায়, সূর্য্যের খরজ্যোতিতে, সূর্য্যালোকরঞ্জিত মেঘমালায়, সরোবরের নির্ম্মল জলে, শৈবালে, শৈবালবেষ্টিত কুমুদ-কমলে, শস্যশোভাময় রমণীয় ক্ষেত্রে, তৃণশষ্পসমাচ্ছাদিত ভূখণ্ডে, বনে, উপবনে, উন্নত পাদপে, দুলিত লতিকায়, তুষারে, তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশৃঙ্গে, জলধির তরল-পর্ব্বতময় অসীম বিস্তারে, সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাস এবং সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্যের অবিরামবাহিনী আমোদলহরী। হৃদয়বান্ ব্যক্তি এই সৌন্দর্য্যসুধা পান করিয়া, মনুষ্যদেহেই দেবজনস্পৃহণীয় স্বর্গসুখ সম্ভোগ করেন, এবং ভাষায় তিনি কবি না হইলেও, কাব্যের এই প্রাণগতরস হৃদয়ে পোষণ করিয়া কৃতার্থ হন। তাঁহার নিকট প্রভাত, সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন ও গভীর নিশীথিনী সকলেই সামবেদী ঋষির ন্যায় সৌন্দর্য্যের স্তুতিগীত গান করে, এবং তদীয় চিত্ত সৌন্দর্য্যসলিলে ভাসিয়া ভাসিয়াই সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া থাকে, এবং সর্ব্বপ্রকার কলুষপঙ্কিলতা, ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা হইতে বিনা প্রযত্নেই নির্ম্মুক্ত রহে।

কিন্তু এই যে সৌন্দর্য্যের উল্লেখ হইল, ইহা কি সকল স্থলেই একরূপ?—না ইহাতে বিচিত্রতা আছে? পর্ব্বতে যে সৌন্দর্য্য, পর্ব্বতপ্রান্তবাহিনী তরঙ্গিণীতেও কি সেই সৌন্দর্য্য? পাদপের দৃঢ়তা ও দৃক্পাতশূন্য পৌরুষে যে কান্তি, পাদপকণ্ঠশোভিনী পুষ্পময়ী ব্রততীতেও কি সেই কান্তি? যাহার চক্ষু আছে, তিনিই বলিবেন,—না।

যেমন কবিতায় রসবৈচিত্র্য, তেমন সৌন্দর্য্যেও বিচিত্র

প্রভেদ। সৌন্দর্য্য অনেক প্রকার। উহা কোথাও ভয়ানক, কোথাও কারুণ্যব্যঞ্জক,—উহাতে কোথাও ভক্তির উদ্দীপনা, কোথাও প্রীতির প্রবর্ত্তনা। অমাবস্যার রাত্রি, ঘোরতর অন্ধকার, আকাশে নিবিড় ঘনঘটা, বায়ুর শ্বাসপ্রশ্বাসে শোকের সুগভীর নিঃস্বন, মুসলধারে বৃষ্টি, মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুতের স্ফূর্ত্তি, মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাত, জলে স্থলে এক, শূন্যে অশূন্যে সমরূপতা, এই এক প্রকারের সৌন্দর্য্য,—ভয়ঙ্কর, রোমহর্ষণ, নিরুপম। এই প্রকারের সৌন্দর্য্যে হৃদয়ে বিলাসের আবেশ হয় না, হৃদয় সুখসংস্পর্শেও শীতল হয় না ; উহা ক্রমশঃ কেবল স্তম্ভিত হইতে থাকে, এবং স্তম্ভিত হইয়াও ক্রমে ক্রমে স্ফীত হইয়া উঠে। আবার লতাবৃত বিনোদকুঞ্জে কৌমুদীর ক্রীড়াকৌতুক, দুর্ব্বাদলে শিশির, সুন্দরীর কমনীয় ললাটে চূর্ণকুন্তল, শিশুর সরল হাস্য, এই সকল আর এক প্রকারের সৌন্দর্য্য,—প্রাণারাম, প্রিয়দর্শন, প্রীতিপ্রদ। হরগৌরীর অপরূপ সম্মিলনে এই উভয়বিধ সৌন্দর্য্যেরই আভা রহিয়াছে। এই জন্যই বলিয়াছি, ইহাতে পূর্ণসৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বিত। অণুমাত্রায় হইলেও ইহাতে পূর্ণতার কিঞ্চিৎ ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে,—কবির কল্পনা, পরস্পর-বিরোধিনী বিচিত্রতার একত্র সমাবেশ করিতে চেষ্টা করিয়া, অতি অল্প পরিমাণে হইলেও ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছে। ইহাতে,—

"আধ গলে শোভে গরল কালা,
আধই সুধা মাধুরী রে।"

সুতরাং যাহাতে আতঙ্ক, আমরা এই মূর্ত্তিতে তাহারও প্রতিকৃতি দেখিতে পাই ; যাহাতে আনন্দ, আমরা তাহাও এই মনোহর মূর্ত্তিতে সন্দর্শন করিয়া প্রীত হই। ইহাতে মধুরিমা ভয়ের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, ভয় মধুরবেশে মন মোহিত

করিতেছে। ইহাতে কাঠিন্য কোমল হইয়া গিয়াছে, কোমলতা কাঠিন্যে পরিণতি পাইয়াছে। কে এ রূপ একবার দেখিলে বিস্মৃত হইতে পারে?—যেখানে হৃদয় যাই যাই বলিয়াও যাইতে সাহস পায় না, এবং যে অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য হইতে চিত্ত দূরে যাইতে ইচ্ছুক হইলেও যাইতে পারে না, কে তাহার মন্ত্রমোহ হইতে মুক্ত রহিবে?

এই হরগৌরীচিত্রের অন্তঃস্থ অস্ফুট অর্থ মানবপ্রকৃতির পূর্ণাবয়বতা। মানবপ্রকৃতির কোন কোন বৃত্তি ফণীর মত গর্জ্জন করে, কোন কোন বৃত্তি কিঙ্কিণীর কলনাদে হৃদয় মন কাড়িয়া লয়;—কোন কোন ভাব অগ্নির মত জিহ্বা প্রসারণ করিয়া পোড়াইতে কি গ্রাস করিতে আসে, কোন কোন ভাব শরীরে অমৃতধারা ঢালিয়া দেয়। যখন মনুষ্য ক্রোধে প্রজ্বলিত, তাহাকে তখনও দেখিও; যখন সে স্নেহে বিগলিত, তাহার তদানীন্তন মাধুর্য্যও একবার দেখিয়া লইও। মনুষ্যের অভিমান সর্ব্বদাই 'দূরে রহ' বলিয়া, দর্প সহকারে তোমাকে ইঙ্গিত করিতেছে, মনুষ্যের মমতা জ্যোৎস্নার হিল্লোলের ন্যায় তোমার তাপিত অঙ্গে আপনা হইতে আসিয়া, গড়াইয়া পড়িতেছে। মনুষ্যচক্ষের কোনরূপ দৃষ্টি বিষাক্ত শলাকার ন্যায় তোমার মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া যাইতেছে, এবং উহা যতদূর প্রবিষ্ট হইতেছে, ততদূরই যেন প্রতপ্ত-লৌহ কি প্রতপ্ত-গরল-স্রোতে বহিতেছে; আবার মনুষ্যেরই আলস্যময়, আবেশময়, প্রাণস্পর্শী নয়নভঙ্গি তোমায় উন্মাদিত করিয়া তুলিতেছে;—যে কল্পকানন স্বপ্নে বই কেহ দেখিতে পায় না, অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য তোমায় তাহার সুস্নিগ্ধ শ্যামল জ্যোতিঃ দেখিতে দিতেছে। কবিকল্পিত হরগৌরী মূর্ত্তিতে এই উভয়বিধ ভাবেরই একত্র নিবেশ; ইহাতে যেমন নানারূপ সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব মিশ্রণ,

তেমন পুরুষকার ও প্রীতিরও অপূর্ব্ব সম্মিলন। ইহাই মনুষ্যের চরমোৎকর্ষ। ইহাতে ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও পটাম্বর আলিঙ্গনবদ্ধ, ইহাতে ফণী ও মণি, জটাজূট ও চারুকবরী, ধবল বিভূতি ও গন্ধ কস্তুরী একাধারে জড়িত গড়িত। অলৌকিক কালিদাস এই মোহন মূর্ত্তির আভা দর্শন করিয়াই দিলীপ বর্ণনে বলিয়াছেন, যে,—

"ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ স বভুবোপজীবিনাং।
অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ।"—

এবং কালিদাসের আদিগুরু আদিকবি বাল্মীকিও শোভা ও সামর্থ্যের এই সম্মিলন ধ্যান করিয়াই কখনও রামের কোদণ্ড-টঙ্কারে ও জলদ-গম্ভীর গর্জ্জনে ত্রিভুবন কম্পিত করিয়াছেন, কখনও বা রামচন্দ্রের করুণবিলাপ ও অশ্রুবর্ষণে বনের পশু পক্ষীকেও বিলাপ করাইয়াছেন;—পাষাণে দ্রবময়ীর লীলা দেখাইয়া, পাষাণে কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত করিয়া, লোককে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ রাখিয়াছেন।

বিধাতা মনুষ্যকে দুটি চক্ষু দিয়াছেন। কিন্তু সংসারে অধিকাংশ মনুষ্যই কাকের মত এক চক্ষে দেখিয়া থাকেন, এবং একার্দ্ধ মাত্র দেখিতে পান বলিয়া, মানবমহিমার একার্দ্ধেরই উপাসনা করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও নিকট শুধু পৌরুষ গুণেরই গৌরব ও সম্মাননা। তাদৃশ ব্যক্তিদিগের বিবেচনায় যে কোন ভাব, যে কোন বিষয় এবং যাহা কিছুতে হৃদয়ের গন্ধ আছে, অবলাপ্রকৃতির সম্পর্ক আছে এবং অবলা-জনসুলভ সারল্য, কোমলতা, পরমুখপ্রেক্ষিতা, ও পরের প্রতি নির্ভরের ছায়া আছে, তাহাই দূষণীয়, তাহাই জঘন্য। তাঁহারা আত্মীয়জনের উপকার করিতে প্রস্তুত, কিন্তু আত্মীয় জনকে আদরে পরিতুষ্ট করিতে তাঁহারা লজ্জা অনুভব করেন। তাঁহারা

বন্ধুতার অনুরোধে বিপৎসময়ে সাহায্য দান করিতে অসম্মত নহেন, কিন্তু কোন অনুরোধেই কাহাকেও স্নেহের সজলনয়নে অভিনন্দন করিতে তাঁহারা সম্মত হয়েন না। এ সকল তাঁহাদিগের চক্ষে যেমন অনাবশ্যক, তেমন অবজ্ঞেয়, তেমনই উপহসনীয়। তাঁহাদিগের আদর্শ পুরুষ আপনাতে আপনি দৃঢ় হইয়া, লৌহস্তম্ভের মত দণ্ডায়মান থাকিবেন, কখনও পরের কণ্ঠে ভর করিবেন না; তিনি শত্রুমর্দ্দনে একে এক সহস্রের মত কার্য্য করিবেন, কিন্তু কখনও সুহৃৎসমাগমে ঢলিয়া পড়িবেন না; তাঁহাতে মার্ত্তণ্ডের প্রখর দীপ্তি থাকিবে, কিন্তু কখনও চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কান্তি বিলাসিত হইবে না; তিনি সুখে সুখী হইতে পারেন, কিন্তু সুখে কখনও কৃতজ্ঞ হইবেন না; এবং বিরহ, বিয়োগ প্রভৃতি দুঃখ তাঁহার চরণোপান্তে প্রবাহিত হইয়া যাইবে, কিন্তু কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না।

পক্ষান্তরে, এমনও অনেক ব্যক্তি আছেন যে, তাঁহারা পৌরুষধর্ম্মে পূজার উপযুক্ত সামগ্রী কিছুই দেখিতে পান না, কিন্তু প্রীতির মোহিনী মায়া এবং ঢল ঢল লাবণ্যরাশিকেই সর্ব্বস্ব মনে করেন। তাঁহাদিগের অভিধানে বিষয়লিপ্সা ও কার্য্যকুশলতার নাম কপটতা, পরাক্রমের নাম পাপ, বীরগর্ব্ব ও অভিমান অধোগতির প্রশস্ত পথ। যে সকল পুরুষ আঘাতের উত্তরে প্রতিঘাত করিয়া, পৃথিবীতে চিরকাল কেবল মল্লযুদ্ধেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন; যাঁহারা সূচির ন্যায় কূটচক্র ভেদ করিয়াছেন, রিপুকুলের মস্তকে বজ্রের ন্যায় ভীমশব্দে নিপতিত হইয়াছেন, এবং কোথাও বা ঝটিকার ন্যায় সম্মুখস্থ সমস্ত বিঘ্ন বাধা বেগে উড়াইয়া লইয়াছেন, তাঁহাদিগের চক্ষে তাদৃশ ক্ষণজন্মা ব্যক্তিরাও অপদেবতার অবতার। এই সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ কুসুমের ন্যায় কোমল হইবেন, কিন্তু তাঁহাতে কণ্টকের

কোন লক্ষণ থাকিবে না; তাঁহার নেত্রযুগল হইতে সুখে দুঃখে সকল সময়েই ধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইবে, প্রণয় তাঁহার হৃদয়কে একবারে ডুবু ডুবু করিয়া রাখিবে, এবং তাঁহার দৃষ্টি ও কথায় কেবলই মধু ক্ষরিবে। তিনি বিনীত, তিনি শান্ত, তিনি ক্রোধাদিবিকাররহিত। তিনি সংসারে নির্লিপ্ত। তিনি শত্রুর নিকটও পদানত। তিনি মৃদুতার সজীব প্রতিমূর্ত্তি।

যাঁহারা পূর্ণতার উপাসক, তাঁহারা এই উভয় সম্প্রদায়েরই আংশিক অনুসরণ করেন, অথচ এই উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ রূপে যাহা অনুভব করিতে না পান, তাহা অনুভব করিয়া, উভয়েরই অগম্য এক উচ্চতর গ্রামে আরূঢ় হন। তাঁহাদিগের বিবেচনায় যে পৌরুষে প্রীতি নাই, কেবল স্বার্থ আছে, তাহা শ্মশানসদৃশ; এবং যে প্রীতিতে পৌরুষের অবলম্ব নাই, কেবল অসার সৌরভ আছে, তাহা শুষ্ক ও দলিত পুষ্পদলসদৃশ। তাঁহারা এই নিমিত্ত পৌরুষ ও প্রীতির সম্মিলিত অবস্থাকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া পূজা করেন, এবং যাহাতে প্রতিমনুষ্যেই এই উভয় ভাবের সমুচিত বিকাশ হয়, যাহাতে প্রত্যেকেই অংশতঃ পুরুষ ও অংশতঃ অবলা-স্বভাব হইয়া, গঙ্গাসাগরসঙ্গমের ন্যায় এক তীর্থ-স্বরূপ হইতে পারেন, ইহাই তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করেন। তাঁহাদিগের আদর্শ এই হরগৌরীমূর্ত্তি, একার্দ্ধে প্রলয়, অপরার্দ্ধে প্রাণদান—একার্দ্ধে সমাধির নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্য, অপরার্দ্ধে ঈষদ্ধসিত প্রফুল্লতার প্রিয় আকর্ষণ। তাঁহাদিগের ধর্ম্মনীতি কাপুরুষকে অবজ্ঞা করে; যে ভীরু, যে নিরভিমান, যে আঘাতে উত্তেজিত হয় না, অপমানের নিদারুণ দংশনেও জ্বলিয়া কি জাগিয়া উঠে না, যাহার চিত্ত কোনরূপ কঠোর সাধনাতেই সাহস পায় না, যাহার মন কার্য্যের সময় ফুৎকারেরও ভর সহে না, তাহাকে উহা মনুষ্যগণনারই বাহিরে রাখে। অথচ, যাঁহারা

ক্রূরকর্ম্মা, যাঁহারা নিষ্ঠুর, যাঁহারা কিছুতেই আর্দ্র হন না, কিছুতেই কাহাকেও আর্দ্র করিতে পারেন না, যাঁহারা প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিতে জানেন না, প্রাণ দিয়া পরের পূজা করিতে ইচ্ছা করেন না,—যাঁহারা ঐশ্বর্য্যের আনন্দ চাহেন, কিন্তু স্নেহের অধীনতায় কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আছে, তাহা বুঝিতে চাহেন না, ঐ প্রশস্ত নীতি তাঁহাদিগকে অধম পুরুষ বলিয়া ঘৃণার চক্ষেই নিরীক্ষণ করে।

মনুষ্যের একটি আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। মনুষ্য আপনার অভাব ও অপূর্ণতাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিবার জন্য ভাষাকে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করে, এবং নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি করিয়া, ঐ সমস্ত নূতন শব্দের আবরণেই আপনার রুগ্নতা ও ক্ষীণতা ঢাকিয়া রাখিতে যত্নশীল রহে। আমরা উপরে পৌরুষ-বিরোধী ও হৃদয়-বিরোধী এই দুইটি বিভিন্নশ্রেণিস্থ ব্যক্তিদিগের মতি ও গতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই এ কথার অতি সুন্দর নিদর্শন আছে। যাঁহারা পৌরুষ-বিরোধী, তাঁহাদিগের মুখে আমরা সকল সময়েই শান্তি, ক্ষমা, নির্ব্বেদ, বৈরাগ্য, শত্রুর প্রতি দয়া, বিশ্বজনীন প্রীতি ইত্যাদি কতকগুলি পবিত্র শব্দ শুনিতে পাইয়া থাকি। তাঁহারা দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে এই সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করেন, এবং এই সকল শব্দের সহায়তা লইয়াই পৃথিবীর রঙ্গভূমি হইতে পৌরুষ ও পরাক্রমের সকল প্রকার ক্রীড়া এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগের অপবাদ ও কলঙ্ক দূর করিবেন বলিয়া আশান্বিত হন। তাঁহারা যখন আহত হইয়া শয্যাগত থাকেন, তখন উহা পরকাল-চিন্তা; তাঁহারা যখন ভয়ে কণ্টকিত হইয়া অঞ্চলের আশ্রয় লন, তখন উহা বিরোধবিমুখতা। হায়! এই ধর্ম্মই যদি মনুষ্যজাতির পরিত্রাণের ধর্ম্ম হইত, তবে ইতিহাস কাহাদিগের কাহিনী শুনাইয়া

মনুষ্যের চিত্ত বিমোহিত করিত? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণার্জ্জুন, সেকেন্দর, সিজর, হানিবাল ও বোনাপার্টি প্রভৃতি ধুরন্ধর পুরুষদিগের দিগন্তবিশ্রুত নাম কোথায় থাকিত? থর্ম্মপোলীর অতুল কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া, কে আনন্দে উচ্ছ্বলিত হইত? আর, জগতে অদ্যাপি যে সকল অবদান পরম্পরা অহরহ্ অনুষ্ঠিত হইতেছে, কোথায় তাহার চিহ্ন থাকিত? কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই, যাঁহারা পৌরুষের নিন্দা করেন, তাঁহারা শব্দের সৃষ্টি করিতে যেমন বিচক্ষণ, মানবপ্রকৃতির পরিবর্ত্ত-সাধনে তেমন সক্ষম নহেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের শব্দসম্পদ লইয়া সুখে নিদ্রাভোগ করুন।

যে শ্রেণির ব্যক্তিরা হৃদয়গত উৎকর্ষের বিরোধী, তাঁহাদিগের প্রধান কথা, 'দুর্ব্বলতা'। তাঁহারা সকল করিতে পারেন ও সকল সহিতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের দ্বারে ভিখারী রোদন করিতেছে, দিনান্তে মুষ্টি ভিক্ষা পায় নাই বলিয়া, কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে, কিন্তু তাঁহারা তাহার প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিবেন না। কারণ, ইহা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা। যে তাঁহাদিগের মুখে একটি প্রিয়কথা শুনিলেই আহ্লাদে অবশ হয়, তাঁহারা তাহাকে প্রাণান্তেও প্রিয় সম্বোধনে সম্ভাষণ করিবেন না। কারণ, ইহা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা। জীবনের চিরসঙ্গিনী, অশেষ মানসিক যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া, প্রণয়-পিপাসু নয়নে পুনঃপুনঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন; তাঁহারা তাঁহার প্রতি ফিরিয়া চাহিবেন না। কারণ, ইহা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা। যে সকল কার্য্যে লোকে প্রীত হয়, পরিতৃপ্ত হয়, লোকে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ দেয়, তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাতে পরাঙ্মুখ রহিবেন। কেন না, ইহাও হৃদয়ের দুর্ব্বলতা। অহো

মনুষ্য! কিছুই তোমার অসাধ্য নহে। যাহা ঘোরতর পাতক, তুমি তাহাতে পুণ্যের কমনীয়চ্ছবি প্রদান করিতে পার, এবং যাদৃশ আচরণে দয়া অশ্রুবর্ষণ করে, ধর্ম্ম নিপীড়িত হন, তুমি তাহাও পৌরুষের নির্ম্মল নাম লইয়া অনুষ্ঠান কর।

হৃদয়ের দুর্ব্বলতা? দুর্ব্বলতা এ শব্দ কে কোথা হইতে আনিল? আর, যদি মনুষ্যের হৃদয় স্বভাবতঃই দুর্ব্বল হয়, তবে উহা দোষ না গুণ? হৃদয় বিবেকের অগ্রবর্ত্তী। বিবেক যেখানে পহুঁছিতে পারে না, হৃদয়ের গতি সেখানেও অব্যাহত। হৃদয়ের দুর্ব্বলতাতেই অচিন্তনীয় বল। ইহা সত্য যে, মনুষ্য হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ প্রণয়ে পরতন্ত্র হয়, পরের সুখে হাসে, পরের দুঃখে কাঁদে, পরের বিচ্ছেদবেদনায় ক্লিষ্ট হয়, পরচিত্ত-বিনোদনের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, এই হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃই সে গিরিসাগর লঙ্ঘন করিয়া, সাধারণের অসাধ্য কার্য্য সকল অবহেলায় সাধন করিয়া উঠে; এই দুর্ব্বলতার সামর্থ্যেই সে বিপদরাশির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়ে; এই দুর্ব্বলতার মহিমাবলেই সে আপনার অস্থিচর্ম্ম বিক্রয়দ্বারা জাতি বিশেষের উদ্ধারের পথ উন্মোচন করিয়া দেয়। হৃদয়ের দুর্ব্বলতা জ্ঞানে তাহার সহায়, জগতের হিতজনক যশস্কর কার্য্যে তাহার উদ্দীপনা, সমরাঙ্গণে তাহার মনোমাদি শঙ্খধ্বনি, ধর্ম্মে তাহার বীজমন্ত্র, প্রেমে তাহার প্রাণ। মনুষ্য প্রবৃত্তির সজীবতা বৃদ্ধির জন্য যতবিধ মদিরা পান করিয়া থাকে, হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই তন্মধ্যে তাহার প্রধান মদিরা। সংসার যাঁহাদিগের নিকট ঋণী রহিয়াছে, তাঁহারা সকলেই এই মদিরা-পানে বিভোর থাকিতেন।

মনুষ্যের প্রকৃতিকে তুমি সুন্দর বল। কিন্তু উহার সৌন্দর্য্য কিসে?—না হৃদয়ের দুর্ব্বলতায়। মনুষ্য অনেক কার্য্যেই দৈত্য-

দানবের উপমাস্থল বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে ; কিন্তু দেবতার সহিত যে, তাহার উপমা হয়, তাহা শুধু হৃদয়ের দুর্ব্বলতায়। যখন দেখিবে যে, যোদ্ধা ধূমান্ধকার যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে নিপতিত হইয়া, প্রাণ যায় যায় এমন সময়েও করধৃত বারিপাত্র আপনার মুখের নিকট হইতে অপসারণপূর্ব্বক অধিকতর তৃষ্ণাতুর অন্য একজনের মুখে তুলিয়া দিতেছেন, তখন ইহা মনে রাখিও যে, হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই সেখানে তাঁহার বল বিধান করিয়াছে। যখন দেখিবে যে, কোন স্থানে অগ্নির জ্বলন্ত জিহ্বা, মৃত্যুর করাল জিহ্বার ন্যায়, চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া লক্ লক্ ধক্ ধক্ করিতেছে, সকলেই আপনাকে মাত্র বাঁচাইয়া সে স্থান হইতে দূরে পলাইতেছে ; কিন্তু একটি ক্ষীণাঙ্গী ললনা সেই অগ্নি ও সেই সাক্ষাৎ মৃত্যুকে ভয় না করিয়া, একটি সুকুমার শিশুর জীবন রক্ষার জন্য উহার মধ্যে অম্লানবদনে প্রবিষ্ট হইতেছে, এবং আপনি অর্দ্ধদগ্ধ হইয়াও ক্রোড়স্থ শিশুটিকে আবরিয়া রাখিতেছে, তখন জানিও যে, তাহার যাহা কিছু সামর্থ্য, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা হইতেই সে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে। যখন দেখিবে যে, যাঁহার পদাঘাতে পৃথিবীতে ভূকম্প হইত, যাঁহার ঝলসিত অস্ত্রচালনে বিদ্যুৎরাশি খেলা করিত, পর্ব্বতের মেঘস্পর্শী মস্তকও যাঁহার অভ্যর্থনা ও আজ্ঞাপালনের জন্য অবনত হইয়া আসিত, সেই তেজঃপুঞ্জ মহাবীর লোকলীলার অন্তিমক্ষণেও আপনাকে বিস্মৃত হইয়া, স্বজাতির অধোগতি স্মরণেই অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইতেছেন, —যিনি কাতরতা কাহাকে বলে, তাহা কখনও বুঝিতেন না, তিনি আজি জননী ও জন্মভূমিকে কাহার হাতে তুলিয়া দিয়া যাইবেন, এই চিন্তাতেই বালিকার মত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, তখন জানিও যে, হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই তাঁহার রোমে রোমে প্রসৃত হইতেছে ; হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই সেই মহামুহূর্ত্তে তাঁহাকে আত্মদুঃখে

অন্ধ রাখিয়া, পরদুঃখে দাহন করিতেছে। হৃদয় অমৃতের অনন্ত প্রস্রবণ। একটি বালুকণাকে চঞ্চল সূচিশৃঙ্গে তুলিয়া দিলে উহা যতক্ষণ সেখানে অবস্থান করিতে না পায়, যদি ততক্ষণের জন্যও সমগ্র মনুষ্য জাতির হৃদয়প্রস্রবণ একবারে শুষ্ক রহে, তাহা হইলে এই অবনীর অন্তস্তল হইতে এমন এক অশ্রুতপূর্ব্ব হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হয় যে, দূরস্থ গ্রহ নক্ষত্রও তাহাতে চমকিয়া উঠে। হে ধীর! তুমি ইহার পরও কি হৃদয়ের দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হইবে? যিনি এই নিখিল সংসার মধ্যে কেবল আপনাকেই সার জ্ঞান করিয়াছেন, তিনিই মনুষ্যহৃদয়ের দুর্ব্বলতার উপহাস করুন; কিন্তু যিনি আপনার ক্ষুদ্রতাকে পূর্ণতায় প্রসারিত করিতে ইচ্ছা করেন, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা তাঁহার চক্ষে লজ্জার নহে। হৃদয়ের দুর্ব্বলতা হেতুই তুমি আমার, আমি তোমার,—এই আমার বন্ধু, এই আমার বান্ধব, এই আমার আত্মীয় স্বজন, এই আমার স্বজাতি ও স্বদেশ। হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দূরীভূত হইলে, কাহার সহিত আর কাহার কি সম্পর্ক থাকে, বল।

আমরা হরগৌরী মূর্ত্তির স্ফুট ও অস্ফুট দুইটি অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছি, এইক্ষণ ইহার আর একটি অর্থও সংক্ষেপে বিবৃত করিব; এবং যেমন হৃদয়ে অবমাননায় মনুষ্য মাত্রেরই বিড়ম্বনা হয়, হৃদয়ের অবমাননায় সমাজেরও যে, সেইরূপ কি ততোধিক বিড়ম্বনা হইতেছে, তাহা বুঝাইতেই এস্থলে প্রধানতঃ যত্নপর হইব। আমাদিগের বুদ্ধিতে এই হরগৌরী মূর্ত্তিতেই মনুষ্য সমাজের ভাবী সম্পদ প্রতিভাসিত।

মনুষ্যসমাজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নিতান্ত রুগ্ন, জীর্ণ ও বিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। সামাজিক জীবনে কোথাও শান্তি নাই, কোথাও সুখ নাই, কোথাও ভবিষ্যতে বিশ্বাস নাই। যাঁহারা আশা করেন, তাঁহারা নিরাশ হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিক্ষেপ

করেন; যাঁহারা প্রথম হইতেই নিরাশ, তাঁহারা আশাভঙ্গের তীব্র দুঃখ অনুভব না করিলেও, চিরদিন নিরুৎসাহ ও নিরানন্দ রহেন। ইহা কেন? সমাজ অবিরত আবর্ত্তিত হইতেছে, অথচ ইহার উন্নতি হয় না;—মনুষ্য সমাজসংস্করণের জন্য, ইতিহাস, অর্থবাদ, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের সাহায্য লইতেছে,—কখনও কাব্যের সুধারসস্বাদে দিব্য-শক্তি লাভ করিয়া নূতন সৃষ্টি করিতেছে, কখনও বিবেকের অঙ্কুশতাড়নে অধীর হইয়া, যাহা পুরাতন, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে; কিন্তু তথাপি মনুষ্যের মনস্তাপ ঘুচিতেছে না, মনে তৃপ্তি হইতেছে না। ইহার কারণ কি? এই কূটসমস্যা সমাজবিজ্ঞানের বীজ-সূত্র; আর যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারাই ইহার আলোচনা করিতে সমর্থ, এবং তাঁহারাও ইহার প্রকৃত মীমাংসায় অসমর্থ। তাঁহা-দিগের মধ্যে প্রত্যেকেই এই প্রশ্ন অবলম্বনে এক এক অভিনব তত্ত্বের অবতারণ করিয়াছেন; এবং কেহ রাজনীতি, কেহ ধর্ম্ম-নীতি, কেহ বা সমাজনীতির শত শাখায় বিচরণ করিয়া, পরি-শেষে যেখান হইতে আরম্ভ, সেখানেই অবসন্নচিত্তে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আমাদিগের বিশ্বাস এই যে, মনুষ্যসমাজে যত যত প্রকারের দুরবস্থা ও বিকার পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার সমুদয় গুলিই এক-কারণ-সম্ভূত নহে। অতএব একটি কারণ নির্দ্দেশ করিলেই সমাজের বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাধির কারণ নির্দ্দেশ হইবে, এমন সম্ভব হইতে পারে না। একদিকে দেখিতেছি আভিজাত অভিমান কুসুমকোরকস্থ কীটের মত সমাজের মর্ম্মস্থানে দংশন করিতেছে, সামাজিক-শক্তির বিকাশের পথে সহস্র প্রতিবন্ধক জন্মাইয়া, সমাজ বিশেষকে শতাব্দী পশ্চাৎ রাখিতেছে,—আর একদিকে দেখিতেছি, পশুশক্তি ন্যায়ের উপর আধিপত্য স্থাপন

করিয়া স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারে পরিণত করিয়া তুলিতেছে, এবং যাহা লজ্জাকর, ঘৃণাকর ও লোকের অহিতকর, তাদৃশ কার্য্যনিচয়কেও অতি মনোহর পরিচ্ছদ দিয়া, সমাজে প্রচলিত করিয়া উঠাইতেছে। এস্থানে দেখিতেছি, মনুষ্য, পাপে প্রবর্ত্তনার জন্য, বহুবিধ রুচিকর বস্তুর বিপণি সাজাইয়া, মনুষ্যকে তাহাতে আহ্বান করিতেছে; স্থানান্তরে দেখিতেছি, যাহারা অপরাধী, তাহারা নির্দ্দোষ নিরপরাধ ব্যক্তিদিগের স্কন্ধে সকল ভার চাপাইয়া দিয়া, আপনারা অস্পৃষ্ট শরীরে সরিয়া পড়িতেছে। সমাজে বিভিন্নজাতীয় ব্যাধির এইরূপ বিভিন্ন কারণ। কিন্তু যদি তথাপি সোপানের পর সোপানে আরোহণ করিয়া, বহু কারণের এক-কারণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হয়, আমরা অক্ষুব্ধ মনে বলিব যে, সমাজে হরগৌরীর বিচ্ছেদ, অথবা নরনারীর অসামঞ্জস্যই সমস্ত সামাজিক ব্যাধির মূল। যাবৎ না ইহা তিরোহিত হয়, তাবৎ কি কখনও সমাজশক্তির পূর্ণবিকাশ হইবে?

কি উদ্ধত-ইউরোপ, কি উন্নত-আমেরিকা, কি গৌরব-ভ্রষ্ট এসিয়া, কি তিমিরাবৃত আফ্রিকা, ইহার সকল দেশে এবং সকল সমাজেই আমরা মনুষ্যের সমবেত-বুদ্ধি এবং সমবেত-বাহুবলের বিবিধ কার্য্য দেখিতে পাইতেছি, কোথাও সমবেত-হৃদয়ের কোনরূপ কার্য্য দেখিতে পাই না। সুতরাং যে দেশ ও যে সমাজ বুদ্ধিবলে ও বাহুবলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, সেই দেশ ও সেই সমাজই জগতের পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি পাইতেছে, এবং যে দেশ ও যে সমাজ বুদ্ধিবল ও বাহুবল বিষয়ে ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, সেই দেশ ও সেই সমাজই সবল প্রতিবেশীর পাদ-পীড়নে দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে। তোমরা যাহাকে উন্নতি বল, যাহাকে সভ্যতা বল, যে সকল কার্য্যকে উনবিংশ

শতাব্দীর অক্ষয় গৌরব বল, তত্তাবতের অন্তঃপ্রবাহেও কি বুদ্ধিবল এবং বাহুবল ব্যতীত আর কোনরূপ সামাজিকবল দৃষ্টিগোচর হয়? মনুষ্য উত্তরোত্তর বুদ্ধিবলে বলীয়ান্ হইয়া, সাগরের গর্ভ হইতে মণি, মুক্তা, প্রবাল ও রত্ন আহরণ করিতেছে,—অদ্রির পাষাণবক্ষঃ ভেদ করিয়া, আপনার পথ খুলিতেছে; এবং মনুষ্য উত্তরোত্তর বাহুবলে বলীয়ান্ হইয়া, দুর্ব্বলের নিষ্পেষণে নিত্য নূতন মহিমা দেখাইতেছে,—যে দরিদ্র, তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, যে ধনী, তাহার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিতেছে। সমাজে ইহা ছাড়া আর কি হইয়া থাকে? পুরাবৃত্তের স্তবকে স্তবকে কি এই একই কাহিনীরই নানারূপ বর্ণনা নহে, এবং লোকের কণ্ঠেও কি এই একই কথাই ভ্রমণ করে না? ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণী ও রুসিয়া প্রভৃতি সুসভ্যরাজ্যে কোটি কোটি প্রাণী উদরের জ্বালায় অসংখ্য দুষ্ক্রিয়া দ্বারা অবনীকে কলুষিত করিতেছে; কোন স্থানে গো মহিষের ন্যায় পুত্রকন্যা বিক্রয় হইতেছে; কোন স্থানে গণিকাবৃত্তির স্রোত ভয়ঙ্করবেগে বহিয়া যাইতেছে; কোথাও আকাশের চন্দ্র তারা ভ্রূণহত্যাদি দেখিয়া দেখিয়া, ভয়ে থর থর কাঁপিতেছে; এবং কোথাও স্ত্রীহত্যা, মাতৃহত্যা ও পিতৃহত্যাদি পাপের অসহ্যভারে পৃথিবী বসিয়া পড়িতেছে; অথচ ঐ সমস্ত রাজ্যের অধিনায়কেরা কেবল নিজ নিজ বাহুবলবুদ্ধি ও অন্যকে বঞ্চনা করিবারই আয়োজন করিতেছেন, সমাজে আর কি হয় না হয়, তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবারও অবসর পাইতেছেন না। ইহাই কি মনুষ্যসমাজের প্রাকৃত অবস্থা? বিধাতা কি মানবজাতিকে বুদ্ধি ও বাহু এই দুইটি মাত্র শক্তিই প্রদান করিয়াছিলেন?—না, মনুষ্যসমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ বৈভবের জন্য, তাহাতে অন্যান্য শক্তিরও অঙ্কুর রোপণ করিয়াছিলেন?

সামাজিক মনুষ্য এ সকল কথার উত্তর দিতে অক্ষম। যে

ব্যক্তিবিশেষের চারিত্রবিকাশের জন্য হৃদয়ের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেও, সমগ্র সমাজের জন্য তাহা স্বীকার করে না; সে হৃদয়হীন আটিলা ও বরজিয়াকে পশু বলিয়া ঘৃণা করিতে প্রস্তুত হইলেও, হৃদয়হীন মনুষ্যসমাজকে পশুসমাজ বলিতে তাহার ইচ্ছা হয় না। তাহার এই কামনা যে, স্বার্থই প্রত্যেক সমাজের একমাত্র লক্ষ্য থাকিবে, বুদ্ধি সেই স্বার্থের অনুসরণ করিবে, এবং বাহুবল বুদ্ধির সহায় ও সেবক হইয়া, যথেচ্ছ বিচরণ করিতে রহিবে। সে এই নিমিত্তই সমাজের একার্দ্ধকে সর্ব্ববিধ সামাজিক সম্পদে বঞ্চিত করিয়া, গভীরতম অন্ধকারে ফেলিয়া রাখিয়াছে;—এবং সে এই নিমিত্তই, যাহারা ক্ষতদেহে প্রলেপ, যাহারা রোগে ঔষধ, শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে সহানুভূতি, এবং পরার্থচিন্তায় মূর্ত্তিমতী প্রীতি, আজি সমাজের হৃদয়স্বরূপ সেই অবলাজাতিকে ক্রীড়ার পুতুল কি পদসেবার দাসীভাবে নিয়োজিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে।

সমাজের এই অবস্থা কতযুগে পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহা বলিতে পারি না। সমাজে বণিগ্‌বৃত্তি ও বঞ্চনা দিন দিন যেরূপ আদর পাইতেছে, কাব্যে লোকের যেরূপ অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে, মুদ্রাময়ী মহাদেবতার প্রভাব ও প্রভুত্ব যেরূপ বাড়িয়া উঠিতেছে, এবং পরপীড়নাদি অসুরব্যবহারে লোকের অবজ্ঞার ভাব যেরূপ কমিয়া যাইতেছে, তাহাতে শীঘ্র যে কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইবে, এমন আশা করি না। কিন্তু ইহা অকুতোভয়ে নির্দ্দেশ করিতে পারি যে, যে দিন মনুষ্য প্রকৃতির কশাঘাতে উদ্বোধিত হইয়া, সামাজিক-যন্ত্রচালনে বুদ্ধিবল ও বাহুবলের সঙ্গে হৃদয়বলেরও আবশ্যকতা স্বীকার করিবে, সমাজের হরগৌরী সে দিন বিযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন না রহিয়া, পরস্পর মিলিত হইবে। আর যে দিন হইতে এই হরগৌরী-সম্মিলনে সমাজের উভয়ার্দ্ধ এক

হইয়া, সমাজের সম্পদ-বর্দ্ধনে ও সন্তাপ-হরণে, সমাজের শাসনে ও গঠনে সমানরূপে ব্রতী রহিবে, সে দিন হইতে মনুষ্যের শোণিত শোষণ অপেক্ষা মনুষ্যের শরীর-পোষণেই মানবজাতি অধিকতর মনোযোগ দিবে ;—বিজ্ঞান সে দিন হইতে হত্যাকাণ্ডে সহায়তা না করিয়া, সামাজিক দুঃখ-ভার-মোচনেই অনুকূলতা করিতে থাকিবে,—বীরের অস্ত্র অকারণ প্রযুক্ত না হইয়া, অনাথ, অনাশ্রয় ও দীন দুর্ব্বলের বল বিধান করিবে ;—এবং সে দিন হইতে শ্বেত কৃষ্ণে তারতম্য, অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ, ক্ষুধা তৃষ্ণা ও দারিদ্র্য-পাপের প্রায়শ্চিত্তে কারাবাস, কারাগৃহের নরক, এবং স্বজাতির শ্রীবৃদ্ধির জন্য পরজাতির অস্থিচর্ব্বণ প্রভৃতি কলঙ্করাশি পৃথিবী হইতে প্রক্ষালিত হইয়া যাইবে।

শক্তি।

তান্ত্রিকেরা যে মূর্ত্তিকে শক্তি বলেন, এবং যাঁহার পদসেবাকে প্রত্যক্ষ স্বর্গের সোপান বলিয়া উপদেশ করেন, এই প্রবন্ধে তাঁহার উল্লেখ হইতেছে না। আমরা যে শক্তির প্রসঙ্গ করিব, উহা নিরাকার হইয়াও সাকার, এবং সাকার হইয়াও নিরাকার। উহা এক অথচ বহু। উহার চক্ষু নাই, অথচ বিশ্বের সকল চক্ষু উহার শাসনের অধীন। উহার হস্ত নাই, অথচ উহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া, জগতের একখানি হস্তও পরিচালিত হয় না। উহার চরণ নাই, অথচ তাড়িতবেগও উহার নিকট পরাজিত। কিন্তু আমরা কিরূপে এই নিত্য-অনুভূত, অথচ অনির্ব্বচনীয় পদার্থের ব্যাখ্যা করিব? শব্দের অর্থ প্রকাশের জন্য দার্শনিকগণ যেরূপ সংজ্ঞাপ্রণালী অবলম্বন করেন, আমাদিগের নিকট এস্থলে তাহা ভাল বোধ হইতেছে না। সংজ্ঞা দ্বারা মনোগত ভাব পরিস্ফুট করা বড়ই কঠিন। যাঁহারা পারেন, তাঁহারা কৃতী। আমরা এই নিমিত্ত, 'শক্তি' এই শব্দটির সংজ্ঞা করিতে যত্নবান্ না হইয়া, কতিপয় উদাহরণ দ্বারা উহার অর্থ প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব।

মনে কর, কেহ তাপিত কলেবরে গৃহপ্রাঙ্গণে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; আর সমীরণের মৃদুমন্দ হিল্লোল, যেন ক্রীড়াচ্ছলে, স্পর্শে স্পর্শে, তাঁহার সেই তাপিত অঙ্গ শীতল করিতেছে। সেই সুখোপবিষ্ট ব্যক্তি, হয় ত এতক্ষণ সমীরণের সুশীতল স্পর্শসুখই অনুভব করিতেছেন;—সমীরণ, কিরূপ সসঙ্কোচ ভাবে, উদ্যা-

নের লতায় লতায় কুসুম চুম্বন করিয়া, বিচরণ করিতেছে,—কিরূপ আদরের সহিত সম্মুখস্থিত তরুরাজির নবোদ্গত পত্রাবলী ক্ষণে ক্ষণে বিকম্পিত করিতেছে,—কিরূপ প্রণয়িজনোচিত যত্নের সহিত তাঁহার শরীরের স্বেদবিন্দুচয় অপনয়ন করিতেছে, তাহাই দেখিতেছেন ও ভাবিতেছেন। উহা যে, জড়প্রকৃতির একটি অতিপ্রধান শক্তি, তাহা তাঁহার মনে প্রতিভাত হইতেছে না। কিন্তু তিনি যখন আবার সেই মৃদুবাহিসমীরণকে ভয়ঙ্কর বেগে প্রবাহিত হইতে অবলোকন করেন,—যখন দেখিতে পান যে, উহা আর তরুর পত্রে পত্রে এবং ফুলের দলে দলে খেলিতেছে না, কিন্তু ঘোরগভীর গর্জ্জনে বিশ্ব চমকিত করিয়া, মূলের সহিত তরু উৎপাটন করিতেছে এবং তরুর সহিত লতার বন্ধন ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে; তখন তিনি, স্বভাবতঃই উহার শক্তিমত্তা অনুভব করিয়া, ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হন। প্রকৃতির শক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকাশিত হইলে, কে তাহার অস্তিত্বে সন্দিহান হইতে পারে?

শুধু সমীরণ নহে, জড়জগতের সকল শক্তিই এইরূপ স্বতঃ-প্রতীয়মান। ঊষার শিশিরবিন্দু দুর্ব্বাদলে মুক্তাহারের ন্যায় শোভা পায়;—প্রভাতের দীপশিখা নিভু নিভু জ্বলিতে থাকে, এবং কি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করে। দেখিয়া, লোকের দেখিবার জন্য আরও ইচ্ছা হয়। তৎকালে, জল কিম্বা অগ্নির শক্তি একবারও মনে সমুদিত হয় না। কিন্তু গিরিপ্রস্থ হইতে প্রলয়-ধারার ন্যায় প্রপতিত জলধারা অবলোকন করিলে; অথবা পর্য্যটনক্রমে, কোন সময়ে দাবদাহের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির সম্মুখীন হইলে, সেই বিস্ময়জনক বেগ,—সেই ত্রাসের ধ্বজারূপিণী লোলজিহ্বা, জল এবং অগ্নিকে সহজেই সৃষ্টির দুটি অতিপ্রধান শক্তি বলিয়া প্রতীতি জন্মায়। জড়জগতের যে সকল শক্তি

নিয়ত আমাদিগের উপর কার্য্য করিতেছে, আমরা এইরূপে বিনা যত্নেই তাহাদের পরিচয় পাইতে পারি। দিবসে যামিনীতে, জাগ্রত কি নিদ্রিত সকল অবস্থাতে আমরা উহাদের অধীন। মৎস্য যেমন জলরাশির অভ্যন্তরে অবস্থান করে,—ওষ্ঠে পৃষ্ঠে ললাটে সকল দিকেই জল; জলে ভাসে, জলে ডুবিয়া যায়, জড়প্রকৃতির শক্তি নিচয় সম্বন্ধেও আমাদিগের অবস্থা ঠিক সেইরূপ। জড়শক্তি জলের ন্যায় রাশীভূত হইয়া, আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; আমরা মৎস্যের ন্যায় উহার অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করিতেছি। অগাধ অনন্ত জড়-শক্তি-সাগরে আমরা প্রক্ষিপ্ত কুসুমের ন্যায় ক্ষণে ভাসিতেছি, ক্ষণে ডুবিতেছি; ক্ষণে ক্ষণে ইতস্ততঃ পরিচালিত হইতেছি। আমরা ছাড়িলেও; উহা আমাদিগকে ছাড়ে না। আমরা শৃঙ্খলচ্ছেদ করিয়া, দূরে পলায়ন করিতে চাহিলেও, উহা আমাদিগকে পলায়ন করিতে দেয় না।

কিন্তু আমরা কি জড়শক্তির বন্দনা কি বর্ণনার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি? তাহা নহে। আমরা জড়শক্তিকে অপরিহার্য্য বলিয়া জানিলেও, আরাধ্য বলিয়া মানি না। উহার আরাধনায় আমাদিগের মন আপনা হইতে প্রধাবিত হয় না। উহা অন্ধ এবং অতীব নিষ্ঠুর। উহার কাল অকাল জ্ঞান নাই, পরের সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ, কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই। মাতা, স্নেহের বাহুবল্লী প্রসারণ করিয়া, সন্তানকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে অগ্রসর হন; জড়শক্তি, উহার লৌহ হস্ত বাড়াইয়া, সেই সন্তান কাড়িয়া লয়। যুবতী, প্রেমভরে কণ্টকিতকলেবরা হইয়া, অনিমেষনয়নে প্রিয়তমের নয়নপানে নিরীক্ষণ করিতে থাকে, জড়শক্তি, ফুৎকার দিয়া, সেই নয়নালোক জন্মের মত নির্ব্বাণ করিয়া ফেলে। জড়শক্তির নিয়ত স্তুতিপাঠক

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ শতমুখে উহার স্তুতিগীত গান করিতেছেন,—উহার উপাসনায় অহোরাত্র নিবিষ্ট থাকিয়া, পৃথিবীতে উহার পূজাপদ্ধতি প্রচার করিতে সর্ব্বতোভাবে যত্নপর হইতেছেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত গ্রন্থই জড়শক্তির গুণানুবাদে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। জড়শক্তি সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিলাম, তাহা শুদ্ধ উদাহরণের অনুরোধে। মানব-লোক অথবা মনোজগতের অভ্যন্তর-নিহিত যে সকল শক্তি জড়শক্তি নহে, অথচ সর্ব্বত্র সর্ব্বথা অনুভূত হইতেছে; যে শক্তিচয়কে সমীরণের ন্যায় স্পর্শন অথবা জল কিংবা অগ্নির ন্যায় দর্শন করা যায় না, অথচ আছে বলিয়া প্রতিক্ষণ স্বীকার করিতে হয়, সেই অজড়শক্তির অস্তিত্বচিন্তার পথপ্রদর্শনই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য।

কোন স্থানে বৃহৎ এক শিলাখণ্ড নিপতিত রহিয়াছে; কেহ, বাহুবলে তাহা উত্তোলন করিয়া, অবহেলায় শতপাদ দূরে ফেলিয়া দিল। এই কার্য্যে সকলেই পূর্ব্বোল্লিখিত জড়শক্তির প্রয়োগ স্বীকার করিবে। ইহাতে মানুষী শক্তির সংস্রব আছে, এইরূপ বিশ্বাস করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই। আবার কল্পনা কর, কোন স্থানে সহস্র লোক একত্র হইয়া, প্রমত্তের ন্যায় কোলাহল করিতেছে। কে কাহার বক্ষোবিদারণ, কে কাহার শোণিত পান করিবে, এই চিন্তাতেই সকলে ব্যতিব্যস্ত। নিষ্কোষিত তরবারি চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইতেছে, এবং রবির কিরণস্পর্শে তৎসমুদয় আবার এমন ভয়ঙ্করভাবে ঝলসিতেছে যে, দর্শকবৃন্দ ভয়ে চিত্রিত পুত্তলের ন্যায় স্পন্দহীন। এমন সময়ে, এক প্রশান্তমূর্ত্তি পুরুষ, নিরস্ত্র করে, নিঃশঙ্ক মনে, তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি কাহারও নিকটবর্ত্তী হইলেন না, কাহাকেও ছুঁইলেন না, এবং কাহারও হস্ত হইতে একখানি তরবারি

কাড়িয়া লইলেন না। কিন্তু তাঁহার সেই প্রশান্ত চক্ষু হইতে সকলের উপর পুনঃপুনঃ দৃষ্টিপাত হইতে লাগিল, তাঁহার জিহ্বা হইতে গুটিকত ধ্বনি বিনিঃসৃত হইল, আর অমনি সমস্ত কোলাহল নিবৃত্ত। একখানি বাহুও আর নড়ে না; একখানি তরবারিও আর সঞ্চালিত হয় না। যেন কি এক মন্ত্রপ্রয়োগে সেই মহাত্মা সকলকে একবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অথবা মনে কর, কোন স্থানে সৈনিকগণ, শত্রুসেনা সমাগতপ্রায় দেখিয়া, ভয়ে কাঁপিতেছে; কি করিবে, কোথায় যাইবে, স্থির করিতে না পারিয়া, আপনার অঙ্গে আপনি লুক্কায়িত হইতেছে, সম্মুখ-সংগ্রামে শত্রুর নিকটবর্ত্তী হওয়া অপেক্ষা আত্মহত্যাও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিতেছে। ঈদৃক্ বিপদের অবসরে, এক বোনা-পার্টি, সহসা তাহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, ধীরগম্ভীরস্বরে গুটিকত কথা দ্রবীভূত লৌহের ন্যায় তাহাদিগের হৃদয়ে ঢালিয়া দিলেন;—স্বকীয় তাড়িতদৃষ্টির সঞ্চালন দ্বারা সকলের মানস-ক্ষেত্রে এক নূতন তেজ প্রেরণ করিলেন। আর, ভীরু বীরমদে গর্জ্জিয়া উঠিল। যে, ক্ষণপূর্ব্বে, শত্রুকে সিংহ মনে করিয়া, থর থর কাঁপিতেছিল, এক্ষণ তাহাকে তৃণজ্ঞানে আপনার প্রদীপ্ত ক্রোধহুতাশনে আহুতিস্বরূপ অর্পণ করিতে উদ্যত হইল। উল্লি-খিত ঘটনাদ্বয়ে জড়শক্তির সম্পর্ক নাই। উহাতে যে শক্তির অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারই নাম মানুষী শক্তি। মনুষ্য যদি মনুষ্যত্ব লাভে কৃতার্থ হইতে চাহে, তাহা হইলে মানুষী শক্তিরও আরাধনা হউক।

ইহা বলা বাহুল্য যে, এই উভয় উদাহরণই ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত। অনুসন্ধান করিলে ইতিহাসে এইরূপ শক্তিপ্র-য়োগের দৃষ্টান্তস্বরূপ সহস্র সহস্র ঘটনার উল্লেখ দৃষ্ট হইবে। বস্তুতঃ ইতিহাসে অনুসন্ধান না করিয়াও, আমরা মনঃশক্তির

অসংখ্য দৃষ্টান্তস্থল প্রাপ্ত হইতে পারি। এক শত লোক একত্র হইয়া, কোন এক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; একজন তন্মধ্যে আপনা হইতে কর্ত্তা হইয়া বসে। সে কাহারও নিকট কর্ত্তৃত্বের সনন্দ পায় নাই, কর্ত্তা বলিয়া কখনও অভিহিত হয় নাই; তথাপি সে আপনার বলে আপনিই কর্ত্তা। এক সময়ে যাহারা তাহার সঙ্গী ও সহচর ছিল, এইক্ষণ তাহারা তাহার অধীন। ইচ্ছা করিলেও অধীন, ইচ্ছা না করিলেও অধীন। তাহার দাসত্ব-শৃঙ্খল সকলের গলদেশে আভরণের ন্যায় দুলিতে থাকে; এবং নিজ নিজ অস্তিত্ব তাহার অস্তিত্বে ডুবাইয়া দিয়া, নিজ নিজ মনুষ্যত্ব তাহার মনুষ্যত্বে মিশাইয়া ফেলিয়া, সকলে তাহারই কর্ণে শ্রবণ করে।

এইরূপে উপলব্ধ হইবে যে, জড়শক্তিও যেমন বাস্তব পদার্থ, কাহারও কল্পনার কথা নহে; মনঃশক্তিও সেইরূপ প্রত্যক্ষ-পরিজ্ঞাত বাস্তব পদার্থ, শুদ্ধ একটি বাক্য নহে। জড়শক্তির নিকটও সমস্ত জগৎ যেমন আপনা হইতে শাক্ত, অজড় মনঃ-শক্তির নিকটও মনুষ্যমাত্রেই সেইরূপ স্বয়মিচ্ছু ভক্ত। রাজা, প্রজা কেহই কোন সময়ে মনঃশক্তির সেবা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। পুরাকালেও লোকে মনঃশক্তির নিকট কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান হইয়াছে, আজও সেইরূপ হইতেছে, এবং শক্তি ও শাক্তের এই নিকট সম্বন্ধ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকিবে, সন্দেহ নাই।

মানুষী শক্তির কার্য্যক্ষেত্র দুই;—জড়জগৎ এবং মনো-জগৎ। জড়জগতের উপর উহা কিরূপে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহা সকলে প্রত্যক্ষ করিতেছে। অনন্ত জড়জগতে মনুষ্য শুদ্ধ দুখানি হাত, দুখানি পা লইয়া প্রবেশ করিয়াছিল। এইক্ষণ দেখ, মনুষ্যই জড়জগতের রাজা। জড়-

রাজ্যের সকল বিভাগ হইতেই তাহার রাজকর গৃহীত হইতেছে; তদীয় জয়-বৈজয়ন্তী সর্ব্বত্র শোভা পাইতেছে। আকাশের বজ্র বিদ্যুৎ তাহার বার্ত্তাবহের কার্য্য করে; সাগর স্বকীয় ঊর্ম্মিবক্ষে তাহার দেশদেশান্তর-যাতায়াতের পথ খুলিয়া দেয়; জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি সমস্ত ভূতশক্তি ভৃত্যের ন্যায় তাহার দ্বারে বদ্ধাঞ্জলি দণ্ডায়মান। যখন যাহার প্রতি যে আদেশ হইতেছে, মস্তক নত করিয়া, তৎক্ষণাৎ সে তাহা প্রতিপালন করিতেছে। যে এক সময়ে শত্রু ছিল, সে এইক্ষণ মিত্র হইয়াছে। যে এক সময়ে প্রভু ছিল, সে এইক্ষণ সেবকের ন্যায় পরিচর্য্যা করিতেছে।

প্রসঙ্গের অতিক্রম হয় বলিয়া, এ বিষয়ে আমাদিগের অধিক কিছু বক্তব্য নাই। মানুষী শক্তি মনোরাজ্যে কিরূপ কার্য্য করে, তাহাই আমরা এইক্ষণ অতিসংক্ষেপে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

একটুকু চিন্তা করিলেই প্রতীতি হয় যে, মনের খেলার জন্য মনোরাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান। মানুষী শক্তি মানবজগতে যেরূপ বিকাশ লাভ করিতে পারে, অন্য কুত্রাপি সেরূপ সম্ভবে না। জড়রাজ্যে উহার গতি অব্যাহত, সুতরাং শিথিল। কিন্তু মানবজগতে উহাকে সর্ব্বদাই প্রতিবন্ধকের সহিত সাক্ষাৎ সংগ্রাম করিতে হয়। মনুষ্যে মনুষ্যে নিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বীর ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। মুখে একের সহিত অন্যের বিরোধ না থাকুক, বাহিরের আচরণে বিরোধের কোন লক্ষণ লক্ষিত না হউক, অথবা স্থূলদর্শীরা তাহাদিগকে পরস্পর প্রণয়বদ্ধ বলিয়াই বিশ্বাস করুক; তাহাদিগের অভ্যন্তরীণ শক্তিগত বিরোধ তথাপি চলিতে থাকিবে। জল যেমন স্বভাবতঃ নিম্নদিকে প্রধাবিত হয়, মনুষ্যও তেমন স্বভাবতঃ স্বাধীনতা ভালবাসিয়া

থাকে। স্বাধীনতা তাহার প্রাণের প্রাণ। মনুষ্যের আত্মা জ্ঞাতসারে হউক, আর অজ্ঞাতসারে হউক, শ্মশানান্ত চিকিৎসা না করিয়া, স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করে না। জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি জড়পদার্থ নিচয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করা যেমন সহজ, মানুষের উপর আধিপত্য স্থাপন করা মানুষের পক্ষে সত্য সত্যই তেমন সহজ নহে। সম্বন্ধে যিনি যতদূর গৌরবান্বিত, ঘনিষ্ঠ, কিম্বা প্রিয় হউন, মনুষ্যের মন, শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া, কখনই সাধ করিয়া তাঁহার অধীন হইবে না। ইহা মানবজাতির প্রকৃতিবিরুদ্ধ ভাব। এইরূপে মনুষ্যে মনুষ্যে ঘাতপ্রতিঘাত চলিতে থাকে; পরিশেষে, যিনি পরীক্ষাতে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন বলিয়া অনুভূত হন, তিনি প্রভুর পদ লাভ করেন; এবং হীনশক্তি ব্যক্তি আপনা হইতেই তাঁহার নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে শাক্ত অথবা সেবক বলিয়া দণ্ডায়মান হয়। অনেক মনুষ্যের বাহিরের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া, আপাততঃ এইরূপ সংস্কার হইতে পারে যে, তাহাদিগের প্রকৃতিতে শক্তির কণামাত্রও বর্ত্তমান নাই। তাহারা পরপ্রভুতার শৃঙ্খল এমন প্রিয়জ্ঞানে বহন করে যে, তাহাদিগকে অমানুষ বলিলেও কোন দোষ হইতে পারে না; কিন্তু ইহা আমাদিগের দেখিবার ভ্রম। আমরা যে সকল পুরুষকে একবারে শক্তিহীন মনে করি, তাহারাও বস্তুতঃ শক্তিহীন নহে। তবে কথা এই, তাহাদিগের শক্তি অতি দুর্ব্বল। যেমন বর্ত্তিকার ক্ষীণ আলোক বায়ুর প্রতিকূলে বহুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না, তাহাদিগের দুর্ব্বল শক্তিও প্রবলতর শক্তির সংঘাতে তেমন বহুক্ষণ তিষ্ঠিতে সমর্থ হয় না।

কবি ও দার্শনিকগণ, মানুষী শক্তির গণনা করিতে হইলে, প্রধানতঃ বুদ্ধি, হৃদয়, সাহস, বিবেক এবং চারিত্রের উল্লেখ

করিয়া থাকেন। ইহাদিগের অনেক অবান্তর ভেদ কল্পিত হইতে পারে, এবং ইহারা প্রত্যেকেই বহুমূর্ত্তিতে লোকলোচনের গোচর হইয়া থাকে। আমাদিগের প্রয়োজনের জন্য এই বিভাগই সম্প্রতি প্রচুর। যে সকল কাব্যে, উপন্যাসে, কিম্বা ইতিহাসে মানবচরিত্র সুচারুরূপে চিত্রিত হইয়াছে, তাহার পত্রে পত্রে, পংক্তিতে পংক্তিতে, মনুষ্যপ্রকৃতির এই সকল শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। জনপ্রবাদও শতমুখে ইহাদিগের মহিমার সাক্ষ্যদান করিতেছে। অমুকে অমুকের বুদ্ধির নিকট পরাজিত হইয়াছে, অমুকের হৃদয় শত্রুকেও মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, অমুকের সাহসের নিকট কেহই অগ্রসর হইতে পারে না, অমুকের চারিত্রগুণে সংসার বশীভূত, ইত্যাদি গভীর অর্থযুক্ত বাক্য লোকের মুখে মুখে ভ্রমণ করিতেছে।

মনুষ্যের এই সমস্ত শক্তি নামমাত্র গ্রহণ সময়ে আমাদিগের হৃদয়কে কম্পিত করে না; প্রয়োগ কালে পৃথিবীও উহাদিগের ভরে বিচলিত হয়। মানব-মন এবং মানব-সমাজের গঠন, বিকাশ, স্থিতি, পরিবর্ত্ত এবং ক্ষয়বৃদ্ধির উপর ইহারাই চিরকাল কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছে। ইহাদিগেরই শাসনে কেহ সিংহাসনে উঠিতেছে, কাহারও সিংহাসন টলিতেছে; কোন নূতন সাম্রাজ্য গঠিত হইতেছে, কোন পুরাতন সাম্রাজ্য, পুরাতন জীর্ণ প্রাসাদের ন্যায়, চূর্ণ হইয়া পড়িতেছে; দেশে রুচির স্রোত পরিবর্ত্তিত হইতেছে; নীতি নিত্য নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে; কোথাও সমাজ উৎপন্ন হইতেছে, কোথাও সমাজ উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। ইতিহাস আর কিছুই নহে, মানুষী শক্তি মানবজগতে কিরূপে স্বাধিকার প্রসারণ করিয়াছে, তাহার এক দীর্ঘকাহিনী।

সাধনা ও সিদ্ধি।



মনুষ্যলোকে যাহা কিছু সুখকর, যাহা কিছু বাঞ্ছনীয়, তাহাই সাধনাসাপেক্ষ। বিনা সাধনায় কিছুতেই সিদ্ধি হয় না। বিদ্যা, বৈভব, মান, প্রণয়, প্রভুত্ব, পরাক্রম, চারিত্র-বল, আত্মশোধন, স্বজাতির উন্নতি, স্বদেশের গৌরববিস্তার, স্বাধীনতা অথবা স্বর্গসুখ, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার সম্পদই সাধনার অধীন। সাধনায় বজ্রবিদ্যুৎ ভৃত্যের কার্য্য করে, পর্ব্বত স্বকীয় পাষাণবক্ষ বিদারণ করিয়া, সাধকের গতায়াতের জন্য পথ খুলিয়া দেয়, অন্ধকার আলোকের ন্যায় দৃষ্টির সহায় হয়, এবং যাহা কল্পনার চক্ষেও কেহ দেখিতে পায় না, তাহা স্বাভাবিক কার্য্যের ন্যায় সুসম্পন্ন হইয়া যায়। এই নিমিত্তই সাধনার নাম ব্রত, সাধনার নাম তপশ্চর্য্যা, এবং সাধনার নাম যোগ। যাঁহারা সাধনার পথে পথিক হইয়া, যত্নসহকারে ব্রত পালন করেন,—তপস্বীর ন্যায় উহাতেই একবারে ডুবিয়া যান, তাঁহারা সিদ্ধ হন। যাঁহারা তাহা না করিয়া, চিরকালই স্রোতের জলে ভাসিতে থাকেন, তাঁহারা চিরকালই ঐরূপ ভাসমান রহেন।

যিনি যে বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে চাহেন, তাঁহাকে তদুপযোগিনী সাধনা অবলম্বন করিতে হয়। যথা, যিনি সরস্বতীর সাধক, তাঁহার একরূপ সাধনা; যিনি জাতীয় স্বাধীনতারূপ মহামন্ত্রের সাধক, তাঁহার আর একরূপ সাধনা। যিনি প্রভুত্বের সাধক, তাঁহার একরূপ সাধনা; যিনি প্রেমের সাধক, তাঁহার আর একরূপ সাধনা। গ্যালিলিও আর গ্যারিবল্ডী, শঙ্করাচার্য্য

আর শিবজী অথবা হাওয়ার্ড আর ক্রমওয়েল, এবং চৈতন্য ও প্রতাপাদিত্য, ইহাঁরা সকলেই অতি শ্রেষ্ঠ কল্পের সাধক, অথচ ইহাঁদিগের সাধনা বিভিন্ন প্রকারের। ইহাঁদিগের কাহারও হস্তে বীণা, কাহারও হস্তে ভেরী। কেহ কেবলই কুসুম চয়ন করিয়াছেন, কেহ কেহ কেবল কণ্টক চয়ন করিয়া, তদ্দ্বারাই পরিশেষে কুসুমকোমল শয্যা রচনা করিয়াছেন। কেহ নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন, কেহ অশ্রুর মূলপ্রস্রবণ পর্য্যন্ত শোষণ করিবার জন্য, আপনার হৃৎপিণ্ডকেও ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু এই অনৈক্যেও একতা আছে, এই বিভিন্নতার মধ্যেও কতকগুলি নিয়ম বিষয়ে অভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা এই প্রবন্ধে সর্ব্ববিধ সাধনার বাজস্থত্রস্বরূপ সেই সাধারণ নিয়মগুলিই অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

সাধনার প্রথম অঙ্গ, উদ্দেশ্যনির্দ্ধারণ—অথবা মন্ত্রপরিগ্রহ। কৃতী পুরুষেরা বহুচিন্তা, বহুপর্য্যবেক্ষণ এবং নিজ হৃদয়ে বহু আলোচনার পর কোন না কোন মন্ত্রে দীক্ষিত হন, এবং শয়নে, জাগরণে, নির্জ্জনে কি লোকারণ্যে সতত ঐ ইষ্টমন্ত্রই জপ করিতে রহেন। এই মন্ত্রগ্রহণেই মনের একতা এবং এই একাগ্রতাতেই উন্নতি। নাবিক যেমন গভীর অন্ধকারের মধ্যে নক্ষত্রবিশেষের প্রতি চক্ষুঃ স্থির রাখিয়া, সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, প্রকৃত সাধকেরাও সেইরূপ আপনার মূলমন্ত্রে মনঃসন্নিবেশপূর্ব্বক অনন্ত সংসারসমুদ্রের তরঙ্গরাজি ভেদ করিয়া, ক্রমশঃ অগ্রসর হন। সুতরাং তাঁহাদিগের দৃষ্টি অর্থযুক্ত, এবং তাঁহাদিগের হাস্য, উল্লাস, আমোদ, উৎসব, ভোগ, বিলাস, শ্রম ও বিরাম সমস্তই অর্থযুক্ত। তাঁহাদিগের প্রতিপদনিক্ষেপেই জীবনের এক একটি কার্য্য। তাঁহাদিগের গতি স্থির।

যখন ইটালীর চিরকীর্ত্তিস্বরূপ ক্ষণজন্মা রায়েঞ্জী, রোমের দুষ্কর্ম্মরত দুর্ব্বৃত্ত আভিজাতদিগের প্রমোদগৃহে উপবিষ্ট রহিয়া, সুরসিক বিদূষকের ন্যায় তাহাদিগকে প্রতিদিন নানাবিধ নূতন কথায় পরিতুষ্ট করিতেন,—কখনও হাসিতেন, কখনও হাসাইতেন, কখনও আপনাকে হাস্যাস্পদ করিয়া, পরের মন যোগাইতেন; যদি কেহ তখন তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, তদীয় ইষ্টমন্ত্র পাঠ করিতে পারিত, সে নিশ্চয়ই ভয়ে কণ্টকিত কিংবা ভক্তিতে স্তম্ভিত হইত। মূর্খেরা তাঁহাকে আমোদলহরীর ফেনা মাত্র মনে করিত, কিন্তু তিনি নিয়ত আপনার মন্ত্র সাধন করিতেন। যখন মন্ত্রিবর কলবার্ট, চতুর্দ্দশ লুইর স্বর্ণময় সিংহাসনের এক পার্শ্বে অতি নির্ব্বোধের মত দণ্ডায়মান থাকিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে রাজনিয়োগ পালন করিতেন, যদি পুরাতন রাজপুরুষগণ তাঁহার সেই লাবণ্যশূন্য, মাধুর্য্যবিহীন নিস্তেজ মূর্ত্তির বহিরাবরণ ভেদ করিয়া, তিনি কি নাম জপ করিতেছেন, তাহা তখন জানিতে পাইতেন, তবে তাঁহারা তদ্দণ্ডেই তাঁহাকে উন্মূলিত করিয়া ফেলিতেন। জন্মান্ধ পৌরবর্গ তাঁহাতে কেবল রূপেরই অভাব দেখিত; কিন্তু তিনি তখন গুণগত পরাক্রমের এক আশ্চর্য্য প্রাসাদ নির্ম্মাণেই অহোরাত্র যত্নপর রহিতেন। যখন বীরশ্রেষ্ঠ বোনাপার্টি, যোসিফিনের মৃণালনিন্দিনী বাহুলতা অবলম্বন করিয়া, পারীসের তদানীন্তন প্রভু প্রসিদ্ধনামা বেরাসের বিহারভবনে তালে তালে নৃত্য শিক্ষা করিতেন, যদি কেহ তখন তাঁহার অন্তরতম মন্ত্রের অস্ফুট গর্জ্জন শ্রবণ করিতে সমর্থ হইত, সে নিশ্চয়ই আতঙ্কে অধীর হইয়া দূরে সরিয়া পড়িত। লোকে ভাবিত, তিনি নৃত্য শিখিতেছেন; কিন্তু যে তালে সমগ্র ইউরোপ এক সময়ে ভয়ানকরূপে নৃত্য করিয়াছিল, তিনি তখন সেই রুদ্রতাল অভ্যাস করিতেন। পৃথিবীতে যাঁহারা কার্য্য

করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই এইরূপ এক একটি মন্ত্র ছিল। তাঁহারা মন্ত্রবলে পৃথিবীকে স্বর্গে তুলিয়া লইয়াছেন, অথবা স্বর্গের শোভা সম্পদ পৃথিবীতে আনিয়া, ছড়াইয়া দিয়াছেন,—মৃতদেহে জীবনী দান করিয়াছেন, এবং পুতুল ও ক্রীড়াকন্দুক লইয়া পর্ব্বত ভাঙ্গিয়াছেন।

যাহারা কোন মন্ত্রেই দীক্ষিত নহে, তাহাদিগের সকলই ইহার বিপরীত। তাহাদিগের জীবন অর্থশূন্য, তাহাদিগের গতি বাতহিল্লোলে তৃণের মত। তাহারা কখনও উত্তরে যায়, কখনও দক্ষিণে গড়াইয়া পড়ে, কখনও পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হয়, কখনও প্রতিকূলবায়ুতে পশ্চিমে নীত হইতে থাকে। তাহাদিগের মন্ত্র নাই, মন্ত্রসাধনা নাই, সুতরাং কিছুই 'কার্য্য' নাই। ক্ষুধার সময়ে তাহারা আহার করে, নিদ্রার সময়ে তাহারা শয়ান রহে; কেহ জাগাইলে তাহারা একটুকু জাগে বা না জাগে, কেহ না জাগাইলে তাহারা ঐরূপ পড়িয়া থাকে। লালসা আর ইচ্ছা এক নহে। লালসা প্রবৃত্তির দাসী, প্রবৃত্তিরই অনুগামিনী;—ইচ্ছা অধীশ্বরী, প্রভাবশালিনী। লালসা প্রবৃত্তির উদ্রেকে উদ্রিক্ত হয়, প্রবৃত্তির নিদ্রিতাবস্থায় নিদ্রিত রহে। ইচ্ছা আপনার ক্ষমতাতেই আপনি উদ্রিক্ত থাকিয়া, সমস্ত প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য করে। বস্তুতঃ ইচ্ছা একটি মহতী শক্তি। যাঁহারা মন্ত্রদীক্ষিত, তাঁহারা লালসাশূন্য, কিন্তু ইচ্ছান্বিত; তাঁহাদিগের ইচ্ছা প্রগাঢ়, ঘনীভূত, কেন্দ্র-নিবদ্ধ। তাঁহাদিগের বুদ্ধি, হৃদয় ও সর্ব্বপ্রকার মানসিক বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগের ইচ্ছাধীন। আর যাহারা উল্লিখিত প্রকার মন্ত্রহীন, তাহারা ইচ্ছাশূন্য, কিন্তু লালসান্বিত। তাহাদিগের সমুদয় মনোবৃত্তিই স্বতন্ত্ররূপে কার্য্য করে, কোনটিই কাহারও প্রভুত্ব মানে না। যদি তাহাদিগের মনে ইচ্ছার কিঞ্চিন্মাত্র স্ফূর্ত্তি জন্মে, সে ইচ্ছা

গাঢ় হয় না, ঘনীভূত হয় না, এবং কোন একটি বিশেষ কেন্দ্রে নিবদ্ধ হইতে পারে না বলিয়াই কদাপি ফলে আসে না।

সাধনার দ্বিতীয় অঙ্গ রহস্যরক্ষা অথবা মন্ত্রগুপ্তি। মন্ত্রগুপ্তি মন্ত্রসিদ্ধির কিরূপ অনুকূল, তাহা সহজে বুঝান এক কঠিন ব্যাপার। কিন্তু যাঁহারা, কল্পনার বিনোদকাননে বিচরণ না করিয়া, মানবজীবনের বহুকণ্টকময় দুর্গম শৈলে পাদচারণা করিয়াছেন, যাঁহারা লোকপ্রকৃতির বহির্দ্দেশেই চিরদিন অজ্ঞের ন্যায় দণ্ডায়মান না থাকিয়া, চিন্তার সহায়তায় উহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পাইয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ভূয়োভূয়ঃ এইরূপ উপদেশও দিয়াছেন যে, কোন মন্ত্রই মন্ত্রগুপ্তির দুর্ভেদ্যবর্ম্মবিরহে দীর্ঘকাল সজীব থাকে না। যে মন্ত্র সাধকের হৃদয়মধ্যে কুপোদক-নিক্ষিপ্ত-লোষ্ট্রবৎ লুক্কায়িত রহিল, তাহা মন্ত্র, যাহা লোকের মুখে মুখে পরিভ্রমণ করিল,—এক কর্ণের পর আর এক কর্ণ এইরূপ করিয়া, সহস্র কর্ণে যাতায়াত করিতে লাগিল, তাহা কথা। কথায় কার্য্য হয় না, কার্য্য যাহা হয়, তাহা মন্ত্রে। অতএব মন্ত্র যাহাতে কথায় পরিণত না হয়, এ বিষয়ে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।*

খৃষ্ট বলিয়াছেন, 'তোমার দক্ষিণহস্ত যে কার্য্য করে, তোমার বামহস্ত যেন তাহা জানিতে না পায়।' অধুনাতন খৃষ্টীয় ইউরোপ দানাদি সম্বন্ধে এ বিধির অনুবর্ত্তী হইয়া না থাকিলেও, মন্ত্রগোপন বিষয়ে ইহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া, কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে। বর্লিনের লৌহময়ী রাজনীতি শুদ্ধ মন্ত্রগুপ্তির মহিমাবলেই বাহুবলদৃপ্ত উদ্ধত ফরাসিজাতিকে পদতলে

* তন্ত্রাদি প্রাচীন শাস্ত্রে এইরূপ আছে যে, গর্দ্দভের কর্ণে মন্ত্র কহিলে, সে মন্ত্র নিষ্ফল হইয়া যায়। ইহার এই অর্থ যে, গর্দ্দভ বড় মুখর।

আনিয়াছে। রুসিয়া মন্ত্র-গোপনবিদ্যায় অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়াই, সমস্ত প্রতিবেশীকে সতত শঙ্কান্বিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। রোমের বর্ত্তমান রাজবৈজয়ন্তী মন্ত্রগুপ্তির প্রসাদেই পুনরায় রোমীয় প্রাসাদসমূহে বহুদিনের পর শোভা পাইতেছে, এবং বৃটিশ মন্ত্রণাও এসিয়া এবং আফ্রিকায় বিশ্বাস-বিমুগ্ধ রাজ্যনিচয়ে এই হেতুতেই সমধিক প্রভাবের সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছে।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, পণ্ডিতবর পিথাগোরাস তদীয় শিষ্যবর্গকে পাঁচ বৎসর কাল মৌনী রহিতে বাধ্য করিতেন, এবং যে এই পাঁচ বৎসরের মৌনব্রত সাধুতার সহিত উদ্‌যাপন করিতে সক্ষম হইত, তাহাকে পরিগৃহীত শিষ্যজ্ঞানে শিক্ষা দিতেন, যে তাহাতে অক্ষম হইত, তাহার নিকট হইতে একবারে বিদায় লইতেন। স্থূলদর্শী ব্যক্তিরা পিথাগোরাসের এই কঠিন নিয়মে যত কেন উপহাস করুন না, ইহার প্রকৃত অর্থ অতীব গভীর। মৌনে মনোনিধান, মৌনে গাম্ভীর্য্য এবং মৌনব্রতেই চিত্তসংযমের প্রথম সোপান। কোন কোন ক্ষীণ-প্রাণ মনুষ্য যে, বিনা প্রয়োজনেও মর্ম্মনিহিত গূঢ়সংকল্প অথবা সম্প্রদায় বিশেষের গূঢ়মন্ত্র প্রকাশ করিয়া ফেলে, ইহার কারণ কি?—না সে তরল, সে লঘু, সে ভারবহনে অসমর্থ, সে লৌকিক যশের জন্য লালায়িত। সে অগাধ-জলসঞ্চারী অবিকারী রোহিতের স্থৈর্য্য ও অটলতায় কি মাহাত্ম্য আছে, তাহা বুঝিতে পারে না। তাহার হৃদয় শফরীর মত, উহা গণ্ডূষ-জলেই নৃত্য করিয়া সুখানুভব করে। কার্য্যের সুসমাপ্তি দূরে থাকুক, কার্য্য আরম্ভ না করিয়াই, সে তাহার পরিণামভোগ্য প্রশংসাবাদের জন্য অস্থির হইয়া উঠে। অবলা যেমন অবলার কণ্ঠে ভর করিয়া, অকারণেও মনের সুখদুঃখঘটিত কথা লইয়া

আমোদ করে, সেও রাজ্যের উত্থান ও পতন এবং সমাজের সৃষ্টি-বিপ্লব-ঘটিত ভয়ঙ্কর কথা লইয়া, আমোদ করিতে সেইরূপ ভালবাসে। পরের চক্ষেই সে সর্ব্বদা দেখিতে চাহে, পরকীয় দৃষ্টিতেই সে বিলম্বিত রহে। সুবিখ্যাত রিশিলু এই শ্রেণির পুরুষদিগকে পুরুষদেহে স্ত্রীলোক বলিতেন। আমরাও ইহা-দিগকে স্ত্রীলোকের দোষযুক্ত বলিয়াই, কৃপার নয়নে দেখিয়া থাকি। ইহাদিগকে যত ইচ্ছা শ্রদ্ধা কর, প্রীতি কর, কাহারও তাহাতে আপত্তি নাই; প্রমোদপ্রসঙ্গে ইহাদিগের সাহচর্য্য গ্রহণ কর, তাহাতেও কাহারও ক্ষোভ দুঃখ নাই। কিন্তু মন্ত্র-ভবনে ইহাদিগকে কখনও আহ্বান করিও না। কারণ, ইহারা মন্ত্ররক্ষায় অসমর্থ, ইহারা স্বভাবতঃ অসিদ্ধ।

সাধনার তৃতীয় অঙ্গ উৎসাহ অথবা মন্ত্রমদ; চতুর্থ অঙ্গ উদ্যম অথবা মন্ত্রপ্রয়োগ; পঞ্চম অঙ্গ আত্মোৎসর্গ অথবা মন্ত্রার্থ আহুতি; ষষ্ঠ অঙ্গ অধ্যবসায় অথবা মন্ত্র-শক্তিতে নির্ভর এবং শেষ ও সপ্তমাঙ্গ অপরাজিত সহিষ্ণুতা অথবা মন্ত্রপূতচক্ষে কাল-প্রতীক্ষা। এই পাঁচটি সাধনার প্রাণ। ইহাদিগের সংমিশ্রণে মনে কি যে, এক অপূর্ব্ব অবস্থা জন্মে, ভাষা আপনিই তাহা যথোচিতরূপে ব্যক্ত করিতে পারে না।

কে বলে যে, মনুষ্য দুর্ব্বল?—কে বলে যে, রোগে মনুষ্যের শক্তিহ্রাস হয়, শোকে তাহাকে দাহন করে, বয়োবৃদ্ধিসহকারে জরা আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে, এবং দুঃখ, দারিদ্র্য ও নানাবিধ দুর্ঘটনায় তাহার আত্মা অবসন্ন হইয়া পড়ে? যাহার হৃদয়ে উৎসাহের উদ্দীপনা নাই, এবং সুতরাং আত্মায় স্ফূর্ত্তি ও অন্তরে চৈতন্য নাই, তাহার পক্ষে এ সকলই সম্ভব বটে। সে বিনা রোগেও রুগ্ন, বিনা বার্দ্ধক্যেও জরাজীর্ণ, এবং শোক দুঃখের কশাঘাত বিনাও চিরম্লান, চিরবিষণ্ণ, চির-

কালের জন্য অকর্ম্মণ্য। কিন্তু যাঁহারা মন্ত্রমদে প্রমত্ত, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা কখনও বৃদ্ধ হন না, এবং জীবনের অন্তিমক্ষণেও তাঁহারা উৎসাহশূন্য ও উদ্যমহীন হইয়া, মনুষ্য-জীবনের অসারতা প্রতিপাদন করেন না। তাঁহাদিগের হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক অনির্ব্বচনীয় তেজঃপ্রবাহ প্রবাহিত হয়; উহা তাঁহাদিগের প্রত্যেক ধমনীতে তাড়িত বেগ প্রদান করে, এবং শরীর যখন ছাড়িয়া দেয়, হস্তপদ শিথিল হইয়া পড়ে, তখনও উহা তাঁহাদিগকে কেমন এক আশ্চর্য্য প্রভাবে যুবার মত সজীব রাখে।

মহাত্মা ওয়াসিংটন অতিবৃদ্ধ বয়সেও যখন স্বজাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেন, তখন তাঁহার নিস্তেজ নেত্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, তাঁহার নিস্পন্দদেহ শক্তির পুনঃসঞ্চারে পুলকিত হইত। তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম নিদ্রাবস্থায়ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। ডেনিয়েল ওকোনেল যখন জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান, আয়র্লণ্ডের মঙ্গলকামনা তখনও তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিত, এবং তাঁহার পবিত্র রসনা হইতে তখনও যে দুই একটি বাক্য বহ্নিকণার ন্যায় স্খলিত হইত, সহস্র সহস্র হৃদয়ে তাহা এক ভয়ানক দাবানল জ্বালিয়া দিত। নিরুৎসাহ ও অবসাদ কাহাকে বলে, হাম্বোল্ড তাহা কখনও জানিয়া যান নাই। যে বয়সে অন্যেরা বৈরাগ্যের ভজনা করে, বিষয়ে বীতরাগ হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘনিঃশ্বাসেই সময়াতিপাত করিতে ভালবাসে, অথবা অতীতস্মৃতির আশ্রয় লইয়া, পুরাতন কথার রোমন্থন করিতে যত্নপর রহে, তিনি তখনও যৌবনের নূতন মত্ততায় জ্ঞান সাধন করিতেন, এবং মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তে নূতন কিছু লাভ করিবার জন্য, যার পর নাই আকুল রহিতেন। লর্ড পামার্ষ্টন যখন চক্ষু মেলিয়া চাহিতেও কষ্ট অনুভব করিতেন, রুসিয়ার

তখনও অনেকে অনিদ্র ও উৎকর্ণ রহিয়া, তাঁহার মন্ত্রণার মর্ম্মার্থ-ভেদ করিতে চেষ্টা করিত। চিরজীবি টিয়ার ভূষণ্ডী কাকের মত ফরাসি-রাষ্ট্রবিপ্লবের ভূকম্প দেখিয়াছেন, প্রথম নেপোলিয়ানের বিজয়দুন্দুভিনাদে নৃত্য করিয়াছেন, তৃতীয় নেপোলিয়ানকে পিতৃব্যেরই সিংহাসনে অধিরূঢ় দেখিয়া, করতালি দিয়াছেন, আবার সে দিন সিডানের বিপৎপাতের পর হইতে পারিসের রুধিরাক্ত দেহে ঔষধি লেপন করিয়া, আপনি যে অদ্যাপি ইহলোকেই রহিয়াছেন এবং অদ্যাপি স্বদেশেরই সেবা করিতেছেন, সংসারকে তাহা কার্য্যতঃ জানাইয়াছেন।* লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে যে, বৃটিশ রাজতরণীর বর্ত্তমান কর্ণধার বার্দ্ধক্যে অত্যন্ত জড়িত হইয়াছেন। কিন্তু আজও বৃটিশ প্রাণ তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইতেছে; বৃটেনিয়ার মন্দীভূত প্রতাপ-স্রোত তাঁহারই অভিঘাতে বেগে বহিতেছে। সাধকের উৎসাহ ও উদ্যম সর্ব্বত্র ও সকল সময়েই এইরূপ। উহা দ্রবীভূত বহ্নি। যে উহা নিভাইতে কিংবা উহার গতিরোধ করিতে যায়, সে আপনিই উহাতে পুড়িয়া মরে।

সাধক সম্প্রদায়ের আত্মোৎসর্গ ইহা অপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়জনক। তাঁহাদিগের এই আত্মোৎসর্গই যথার্থ আরাধনা। ভক্ত যেমন আপনাকে আরাধ্য দেবতার পদারবিন্দে পুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ সমর্পণ করিয়া, উহাতেই বিলীন হইতে কামনা করেন, তাঁহারাও সেইরূপ তনু, মন, প্রাণ সর্ব্বস্বই তাঁহাদিগের আরাধ্য মন্ত্রে আহুতিস্বরূপ উৎসর্গ করিয়া, নিজ নিজ পৃথগস্তিত্বও উহাতেই নিমজ্জিত করিয়া দেন। তখন তাঁহারা তদ্গত, তন্ময় হন। সুখ তখন তাঁহাদিগকে সুখী করে না, প্রশং-

* যখন এই প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন টিয়ার জীবিত ছিলেন।

সার মৃদু, মোহন, মধুর ধ্বনি তখন তাঁহাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, মন স্নেহ মমতার মায়াময় বন্ধনীতে বদ্ধ হইতে চায় না, এবং কিছুই তাঁহাদিগকে তখন দক্ষিণে কি বামে হেলাইতে পারে না। তখন তাঁহারা অত্যন্ত জীবিত এবং এই হেতুতেই অত্যন্ত মৃত, অথবা অত্যন্ত মৃত এবং এই হেতুতেই অত্যন্ত জীবিত রহেন। বাল্মীকির অস্থিপঞ্জর হইতে রাম নামের ন্যায় তাঁহাদিগের মর্ম্মাস্থি হইতেও তখন কেবল একই নামই নির্গত হয়, এবং তাঁহাদিগের পরিগৃহীত মন্ত্র যত কেন দুঃসাধ্য হউক না, আত্মোৎসর্গের অভাবনীয় বলেই তখন তাহা সুসাধ্য হইয়া উঠে।

কাব্য ও পুরাণে যাহাদিগের বর্ণনা দৃষ্ট হয়, সেই সমস্ত প্রাচীন সাধকগণ শীতের সময় হিমরাশিতে পরিবেষ্টিত রহিতেন, অতি ঘোরতর গ্রীষ্মের সময়ে চারিদিকে অগ্নি জ্বালিয়া, তাহার মধ্যে উপবিষ্ট থাকিতেন। কেহ আপনার চক্ষু দুটিকেও সাধনার পরিপন্থী বিবেচনায় উৎপাটন করিয়া ফেলিয়া দিতেন, কেহ অন্য প্রকারে মনোনিবেশে সমর্থ না হইলে, জিহ্বা কিম্বা হস্ত পদ প্রভৃতি অপরিহার্য্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গও অকাতরমনে পরিবর্জ্জন করিতেন। এ সকল কার্য্য সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহার বিচার করা এক্ষণ অনাবশ্যক। সাধারণতঃ বলিতে গেলে প্রকৃতির বিরোধী না হওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু যাঁহারা সাধনায় রত হইতে চান, ত্যাগ এবং আত্মনিগ্রহই তাঁহাদিগের প্রধান সহায়। যাহারা ত্যাগে ভীত, যাহারা আত্মনিগ্রহে কুণ্ঠিত, তাহাদিগের মত লোকের দ্বারা সত্যযুগেও কোন কার্য্য হয় নাই, কলিযুগেও কার্য্য হইবে না।

তুমি জ্ঞানী,—তুমি সরস্বতীর সাধক। তোমার আবার সুখের লালসা কেন? যদি তুমি জ্ঞানের নির্ম্মল আনন্দ

অপেক্ষা সাংসারিক খ্যাতিপ্রতিপত্তিকেই অধিক মনে করিলে,—তোমার আরাধ্য শক্তির প্রসন্নদৃষ্টি অপেক্ষা ভোগ বিলাসের আবিল আনন্দের জন্যই অধিকতর অধীর রহিলে, তবে তোমার আবার সাধনা কি? তুমি প্রেমিক, তুমি অপার্থিব বৈভবের জন্য লালায়িত। এই বণিগ্‌বৃত্তিসম্পন্ন কলুষিত মনুষ্যলোকে যাহা স্বপ্নে বই কেহ দেখে না, কবি ও তাপস বই যাহা কেহ জানে না, এবং তপস্যায় ও কবিমুখে বিনা যাহার পরিচয় পাওয়া যায় না, তুমি সেই জ্ঞানের অগম্য অজ্ঞেয় ধনের জন্য চির-তৃষিত। তোমার আবার ধন, মান, ক্ষতিলাভ গণনা কেন? আর তুমি স্বদেশবৎসল! স্বজাতির বন্ধু। তুমি যে, প্রত্যেক কার্য্যেরই পরিণাম চিন্তার পূর্ব্বে আত্মপরিণাম চিন্তা করিতেছ, দেশ-হিত-ব্রতে ব্রতী হইতে গিয়া, প্রতিক্ষণেই আত্মহিত-ব্রতে অগ্রসর হইতেছ, দেশীয়দিগের মধ্যে স্বাধীনতার পবিত্র নাম লইয়া, ধীরে ধীরে পরাধীনতার বিষাক্ত বীজ ছড়াইয়া দিতেছ, সকলকে স্বর্গের শোভা দেখাইবে বলিয়া, নরকে আনিয়া ডুবাইতেছ,—প্রভুস্বরূপ পূজা করিবে বলিয়া, পদতলে আনিয়া বান্ধিতেছ, তোমারও এ প্রতারণা, এ বিড়ম্বনা কিসের জন্য? তুমি অগ্নিকুণ্ডে আপনাকে ভস্ম কর আর না কর, সে এক পৃথক্ কথা। কিন্তু যদি তুমি জ্ঞান চাও, কি প্রেম চাও, কি স্বজাতীর অভ্যুদয় চাও, তবে আগে আপনাকে বলি দান কর,—আপনার বলিতে যাহা কিছু আছে, তাহা দূরে ফেলিয়া দাও, সাধকের ন্যায় আপনি ক্রুশকাষ্ঠে বিলম্বিত হও, তাহার পর সিদ্ধির কল্পলতা হইতে আপনার আকাঙ্ক্ষিত ফল বাছিয়া লও। জনক রাজা যোগী হইতে পারেন নাই, তিনি তাঁহার কমণ্ডলুটি বড় ভালবাসিতেন। সলোমন জ্ঞানী হইতে পারেন নাই; তিনি জ্ঞান অপেক্ষা সুখসম্ভোগের অধিক আদর করিতেন। একি-

লার্ড প্রেমিক হইতে পারেন নাই ; তিনি প্রেম অপেক্ষা আপনাকে অধিক জানিতেন। রবিস্পীয়র স্বজাতির সুহৃৎ হইতে পারেন নাই ; তিনি দেশের স্বাধীনতা ও গৌরব অপেক্ষা আপনার স্বাধীনতা ও গৌরবের জন্য অধিকতর ব্যগ্র রহিতেন। ইহাঁরা কেহই আত্মোৎসর্গ করেন নাই।

অধ্যবসায় উল্লিখিত সর্ব্বপ্রকার সাধক-ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ। উহা স্বাস্থ্যে অমৃত, উহা রোগে ঔষধ, এবং উহাই মুমূর্ষুর অবলম্বযষ্টি। যদি এ সংসারকে সমুদ্র বল, অধ্যবসায়ই তাহার একমাত্র ভেলা ; যদি সাধনাকে জ্বলন্ত বহ্নি বল, অধ্যবসায়ই তাহার একমাত্র উদ্দীপনা। সাধকের হৃদয়নিহিত যে ভাব যখন হীন-শক্তি হইয়া পড়ে, অধ্যবসায়ই সেইটিকে তখন আশ্রয়দানে দৃঢ় করিয়া রাখে, এবং যে তেজ নির্ব্বাণপ্রায় হয়, অধ্যবসায়ই তাহাকে পুনরায় প্রদীপ্ত করিয়া তুলে। অধ্যবসায় ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ; সৃষ্টিও যদি বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, তথাপি উহা টলে না ; উহা সাহসের সার, ভয়ের কোনরূপ কারণই উহাকে বিচলিত করিতে পারে না।

অভীষ্ট সঙ্কল্প প্রথম উদ্যমেই সংসিদ্ধ হইবে, এমন আশা করা কাহারও উচিত হয় না, এবং প্রথম পদস্খলনে কি প্রথম বিঘ্নদর্শনেই যাহার উদাম-ভঙ্গ, আশা-ভঙ্গ ও ব্রত-ভঙ্গ হয়, তাহার দ্বারাও কখন কোনরূপ কঠোর সাধনা হইয়া উঠে না। অতএব অধ্যবসায়ের আবশ্যকতা। সামর্থ্য আর কি? অধ্যবসায়ই প্রকৃত সামর্থ্য। ঐ যে দুর্ব্বল শিশু, অদূরবর্ত্তিনী স্নেহময়ী জননীর আশ্বাস-প্রদ মধুর হাস্যে উৎসাহিত হইয়া, অল্পে অল্পে দণ্ডায়মান হইবার ক্রম শিখিতেছে, উহার ঐ দুর্ব্বল দেহলতিকা কতবার ঢুলিয়া পড়িবে, কতবার ক্ষত বিক্ষত হইবে, কে তাহা এইক্ষণ বলিতে পারে? কিন্তু হয় ত ঐ

শিশুটির পদভরে পর্ব্বতও এক সময়ে বিকম্পিত হইবে। এক-খানি প্রস্তরের ক্ষুদ্রতম এক অংশও উহার নিকট এইক্ষণ হিমাদ্রিসদৃশ; কিন্তু অধ্যবসায় থাকিলে হয় ত উহার পদ্মের ন্যায় কোমল হস্ত পিরামিড গড়িয়া তুলিবে। বস্তুতঃ, অধ্যব-সায়ের তুলনা নাই। অধ্যবসায় বিঘ্ন বিপত্তির সহিত ক্রীড়া করে, সাগর শোষণ করিয়া ফেলে, এবং সহস্র বিভীষিকা, বজ্রপাত ও ঝঞ্ঝা বায়ুর মধ্যেও তরুলতাশূন্য তুষারমণ্ডিত অচলের ন্যায় নির্ভীক ও নিষ্কম্প রহিয়া আপনার মন্ত্র আপনি সাধন করিতে থাকে।

সহিষ্ণুতা অন্য এক পদার্থ। উহা অধ্যবসায়ের সদৃশ, অথচ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অধ্যবসায় হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। সাধারণতঃ সহিষ্ণুতার অর্থ ক্ষমা, সহিষ্ণুতার অর্থ মৃদুশীলতা। কেহ তোমায় তিরস্কার করিল, তুমি প্রত্যুত্তরে তাহাকে তিরস্কার করিলে না; কেহ তোমার মস্তকে পদাঘাত করিল, তুমি তাহার পদনখও স্পর্শ করিলে না। লোকে ইহাকেই সহিষ্ণুতা বলিবে। কিন্তু সহিষ্ণুতার প্রকৃত নাম কাল-প্রতীক্ষা। যে কার্য্যে যশ নাই, মান নাই, আশু সুখের প্রলোভন নাই এবং সম্মুখেও আশার উত্তেজনা নাই,—যে কার্য্যে এইক্ষণ কোনরূপ সহায় নাই, এবং শত বৎসরেও যাহাতে সাফল্যের সম্ভাবনা নাই, যিনি তাহাতেও হৃদয় মন সঁপিয়া লিপ্ত রহিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সহিষ্ণু, এবং যিনি এই প্রকার সহিষ্ণুতাকে আপ-নার প্রাণের মধ্যে পোষণ করিয়া, ভবিষ্যতের নিবিড় অন্ধকার ভেদ পূর্ব্বক কালের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সাধক, তিনিই যথার্থ পুরুষ।

প্রকৃতির সহিষ্ণুতা দেখ, আজি যে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ সহস্র বিহঙ্গকে আশ্রয় দান করিয়াছে, সহস্র তাপিতদেহ শীতল করি-

তেছে, এক সময়ে তাহা ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র একটি বীজ মাত্র ছিল; প্রকৃতি ধীরে ধীরে উহাকে এইরূপ পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। আজি যে দৃঢ় ভূমি অসংখ্য জীব জন্তুর আবাস-স্থান এবং গ্রামনগরে শোভিত হইয়াছে, এক সময়ে তাহা একটি বালুকণা মাত্র ছিল; প্রকৃতি বালুকণার সহিত বালুকণা বান্ধিয়া, তাহাতেই ধীরে ধীরে এই আশ্চর্য্য ভিত্তি গড়িয়াছেন। আজি যে প্রশস্তহৃদয়া স্রোতস্বিনী লক্ষ লক্ষ প্রাণীর উপজীব্য এবং সমগ্র একটি দেশের সুখ ও সৌভাগ্যের ভার বক্ষে ধারণ করিয়া, গর্ব্বভরে বহিয়া যাইতেছে, এক সময়ে তাহা অতি সূক্ষ্ম একটি রজতরেখা মাত্র ছিল; প্রকৃতি সেই রজতরেখাটিকেই ধীরে ধীরে কি না করিয়া তুলিয়াছেন! আবার, যুগান্তের পরে যে বিপ্লব ঘটিবে, যে বিপ্লবে কত কি উচ্ছিন্ন যাইবে, কত কি উন্মূলিত হইবে,—যে বিপ্লব কোথাও প্রলয়পয়োধির তিমিরাবৃত তরঙ্গমালার ন্যায় ভয়ঙ্কর রাবে গর্জ্জন করিবে, কোথাও কালের সর্ব্বসংহারিণী মূর্ত্তিতে জগতের সুন্দর ও কুৎসিত, স্থায়ী ও অস্থায়ী, দ্রব ও ঘন সমস্ত বস্তু লইয়া ক্রীড়া করিতে রহিবে,—যাহার শ্বাস প্রশ্বাসে অনন্ত অশনিপাত, যাহার আবর্ত্তে আবর্ত্তে অনন্ত জ্যোতিরাবর্ত্ত স্ফুটিত ও আলোকিত হইতে থাকিবে, প্রকৃতি এখনই তিল তিল করিয়া তাহার শক্তি সঞ্চয় করিতেছেন,—নীরবে, নিস্তব্ধ ভাবে, তাহার কারণ পরম্পরার শৃঙ্খল গাঁথিতেছেন,—কেহ দেখে না, দেখিয়াও কেহ বুঝে না, এমন রূপে তাহার উপকরণ সংগ্রহে রত রহিয়াছেন। ইহাই সহিষ্ণুতা। যদি অনন্ত শক্তিও সাধনাব্রতে এইরূপ সহিষ্ণু হইতে পারে, মনুষ্য কি তবে অসহিষ্ণু হইবে?

হায়! যে দেশে বাবদুকতাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, আর সাধনা ক্রমশঃই বিলুপ্ত হইতেছে, সে দেশে কাহার আর কিসে

সিদ্ধি হইবে? যে দেশে প্রত্যেকেই শতমন্ত্রে দীক্ষিত এবং মন্ত্ররক্ষায় সকলেই অশিক্ষিত, যাহাদিগের মধ্যে পরস্পরবিদ্বেষ ও আস্ফালনের নাম উৎসাহ, চীৎকারের নাম উদ্যম, অঞ্চল-বায়ু-সেবনের নাম আত্মোৎসর্গ এবং অবিচলিত নিদ্রার নাম অধ্যবসায়, তাহাদিগের আর ভরসা কোথায়? যাহারা প্রাতঃ-সূর্য্যের অভ্যুদয়ে যে কার্য্যের কল্পনা করে, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই তাহার ফলভোগের জন্য ব্যস্ত হয়,—এক রাত্রিতেই রোম নির্ম্মাণ করিতে চাহে, শ্মশ্রুদ্গমের পূর্ব্বেই জীবনের সকল ব্যাপার সম্পাদন করিয়া, কীর্ত্তিশৈলে আরূঢ় হইয়া বসে, তাহা-দিগের আর আশা কি? তবে জানি না, কবে সাধকের পুনরুদয় হইবে,—কবে আবার সাধনা পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইয়া অন্ধকারকে আলোক করিবে।

সম্পূর্ণ।